পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০০৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে
২ ডিসেম্বর ২০০৪

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০০৪ ॥

সূচীপত্র ঃ

পৃষ্ঠা ১-৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

পৃষ্ঠা ৪-১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির প্রতিবেদন

পৃষ্ঠা ১৮-৫২

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহযোগিতায় জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১ ডিসেম্বর ২০০৩ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভার সম্মানিত আলোচকবৃন্দের প্রবন্ধ ও ভাষণ

পৃষ্ঠা ৫৩-৬০

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২ ডিসেম্বর ২০০৩ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উপস্থাপিত বক্তব্য

পৃষ্ঠা ৬১-৭৩

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

সম্পাদকীয়

২ ডিসেম্বর ২০০৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বছর। ১৯৯৭ সালের এই দিন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি। জুম্ম জনগণের অনেক রক্ত, অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ দেশে-বিদেশে মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং জুম্ম জনগণসহ এই এলাকার স্থায়ী অধিবাসীদের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মানুষ আশা করেছিল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে এলাকায় সত্যিকারের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত-নির্যাতিত এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হবে। জুম্ম জনগণের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া সেনাশাসনের অবসান ঘটবে। রাজনৈতিক হীনস্বার্থে পুনর্বাসিত সেটেলার বাঙালীদের দিয়ে দখলকৃত জুম্মদের জায়গা-জমি ফেরত দেয়া হবে এবং বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে তথা তাদের স্ব স্ব স্থানে সম্মানজনক পুনর্বাসন দেয়া হবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, চরম হতাশা, ক্ষোভ ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং অধিকারকামী জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘ ৭টি বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের ন্যায্য অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্যবাসীর সেই প্রত্যাশা আজ সুদূর পরাহত। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে উলঙ্গভাবে পদদলিত ও লঙ্ঘন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বানচালের লক্ষ্যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে জলন্ত অগ্নিকুন্ডের দিকে ঠেলে দেয়ার অপপ্রয়াস চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অবাধে তল্লাসী অভিযান, ধরপাকড়, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা সৃষ্টি করে সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিয়ে ভূমি বেদখলসহ জুম্ম গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইউপিডিএফ নামধারী একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নানাভাবে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, রাহাজানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব এখন আবার গভীর সংকটের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ও বাংলাভাষি স্থায়ী বাসিন্দারা শান্তি চায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান চায় এবং যথাযথ মর্যাদা নিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে বাঁচতে চায়। তাই এই এলাকার মানুষের ন্যায্য অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চায়। যুগে যুগে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে মানুষ। বিগত সময়ে ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি ও আদায়ের জন্য পার্বত্যবাসীকে যেমনি লড়াই করতে হয়েছে তেমনি আগামী দিনেও চুক্তি বাস্তবায়ন তথা ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য দুর্বার গণআন্দোলন অপরিহার্য। আর সেই সংগ্রামে জুম্ম জনগণসহ সকল অধিকারকামী ও প্রগতিশীল মানুষকে অধিকতর সামিল হওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

#

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

প্রিয় দেশবাসী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জানাচ্ছে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিনন্দন। আপনারা নিশ্চয় সবাই জানেন যে, জুম্ম জনগণের অনেক তাজা রক্ত, অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ দেশে-বিদেশে মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, চরম হতাশা, ক্ষোভ ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং অধিকারকামী জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি পালন করতে বাধ্য হচ্ছে।

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে উলঙ্গভাবে পদদলিত ও লঙ্ঘন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বানচালের লক্ষ্যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে জলন্ত অগ্নিকুন্ডের দিকে ঠেলে দেয়ার অপপ্রয়াস চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী অংশ চুক্তি-পূর্ব সময়ের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অবাধে তল্লাসী অভিযান, ধরপাকড়, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা সৃষ্টি করে সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিয়ে ভূমি বেদখলসহ জুম্ম গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইউপিডিএফ নামধারী একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে নানাভাবে মদদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, রাহাজানি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ধরপাকড়, মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন ও হত্যা, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাংচুর ইত্যাদি শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, বাঙালী গণ পরিষদ, নাগরিক ফোরাম, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ, বাঙ্গালী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ভূঁইফোড় সংগঠন এবং খাগড়াছড়ি জেলার উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতা আবদুল ওয়াদুদ গং পাল্টা কর্মসূচী গ্রহণ করে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অব্যাহত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী বানচালের গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

প্রিয় সংগ্রামী জনতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং জুম্ম জনগণসহ এই এলাকার স্থায়ী অধিবাসীদের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। মানুষ আশা করেছিল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ফলে এলাকায় সত্যিকারের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত, নিপীড়িত-নির্যাতিত এই অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূণঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হবে। জুম্ম জনগণের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া সেনাশাসনের অবসান ঘটবে। রাজনৈতিক হীনস্বার্থে পুনর্বাসিত সেটেলার বাঙালীদের দিয়ে দখলকৃত

জুম্মদের জায়গা-জমি ফেরত দেয়া হবে এবং বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে তথা তাদের স্ব স্ব স্থানে সম্মানজনক পুনর্বাসন দেয়া হবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘ ৭টি বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের ন্যায্য অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্যবাসীর সেই প্রত্যাশা আজ সুদূর পরাহত। চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘ ৩ বছর ৮ মাস সময় পেলেও চুক্তি সম্পাদনকারী শেখ হাসিনার সরকার বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের ষড়যন্ত্র ও অসদিচ্ছার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়নে চরম ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। অপরদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারও ক্ষমতায় আসার পর প্রথম প্রথম চুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক কথা বললেও ক্রমাগত ন্যাক্কারজনকভাবে চুক্তি লংঘন ও চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে পদদলিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়- পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাশাসন ও বিভিন্ন অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, বেদখলকৃত জুম্মদের জায়গা-জমি ফেরত প্রদান তথা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, পার্বত্যাঞ্চলে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ যথাযথ কার্যকরকরণ, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন- যেগুলোর উপর নির্ভর করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান- সে বিষয়গুলো সরকার এখনও তথৈবচ অবস্থায় রেখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ না করে চুক্তি ও আইন লংঘন করে তদস্থলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, চরম সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ দিয়ে তার নেতৃত্বে এবং সেনাবাহিনীর একটি মহলের মদদে চলছে চুক্তি বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা। উপরন্তু অব্যাহতভাবে চলছে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিধ্বংসী নানা সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র ও হামলা, ভূমি বেদখল, ব্যাপক অবৈধ অনুপ্রবেশ, সামরিক দমন-পীড়ন ইত্যাদি হীন কার্যক্রম। যার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখন আবার গভীর সংকটের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুধু পূর্ববর্তী সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ক্ষান্ত থাকছে না, বিগত সরকারের চেয়ে অধিকতর আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে চুক্তিকে পদদলিত করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন জুম্মকে পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন যোগ্য জুম্ম ব্যক্তিকে নিয়োগ না দিয়ে সেটেলার নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- মহালছড়ি, বরকল, পানছড়ি, লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, লংগদু, কাউখালী, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, রামগড় এলাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে। সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্দেশও দেয়া হয়।
- প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের স্ব স্ব জমিজমা প্রত্যার্পণসহ যথাযথ পুনর্বাসন ব্যতিরেকে তাদের রেশন বন্ধ করার পাঁয়তারা চলছে।
- অবৈধভাবে ভূমি অধিগ্রহণ, বনায়ন ও সংরক্ষিত বন ঘোষণা, বহিরাগতদের নিকট ইজারা প্রদান ইত্যাদি অজুহাতে জুম্মদেরকে তাদের চিরাচরিত ভূমি ও বাস্তভিটা থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছে।

- অত্যন্ত সুক্ষ্ম পরিকল্পনা মোতাবেক বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সুকৌশলে বহিরাগতদের তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি প্রদান করা হচ্ছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারী রাখা হয়েছে এবং নানা অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে পার্বত্যঞ্চলে র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মোতায়েন করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনী ও প্রশাসন এর একাংশসহ ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ'কে নিরাপত্তা প্রদানসহ নানাভাবে সাহায্য ও মদদ দিয়ে চলেছে।
- আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে দিয়ে সর্বদলীয় বাঙালী ঐক্য পরিষদ, বাঙালী ছাত্র পরিষদ, কৃষক-শ্রমিক বাঙালী কল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সমন্বয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন' নামে সাম্প্রদায়িক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতঃ ঐ সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, ইউপিডিএফ ও সেটেলার বাঙালীদের দিয়ে যুগপৎভাবে জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচী বানচালের অব্যাহত অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।
- সেনাবাহিনীর শান্তকরণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অধীনে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সেটেলার বাঙালীদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও চুক্তি বিরোধী তৎপরতায় মদদদানসহ তথাকথিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যয় করা হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকরকরণে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক অসহযোগিতা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

প্রিয় অধিকারকামী জনতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ ও বাংলাভাষি স্থায়ী বাসিন্দারা শান্তি চায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান চায় এবং যথাযথ মর্যাদা নিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে বাঁচতে চায়। তাই এই এলাকার মানুষের ন্যায্য অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চায়। যুগে যুগে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে মানুষ। বিগত সময়ে ন্যায্য অধিকার স্বীকৃতি ও আদায়ের জন্য পার্বত্যবাসীকে যেমনি লড়াই করতে হয়েছে তেমনি আগামী দিনেও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষন ও বিকাশে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য দুর্বার গণআন্দোলন অপরিহার্য। আর সেই সংগ্রামে সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থনে অধিকার হারা পার্বত্যবাসীদের অধিকতর সামিল হওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭ম বর্ষপূর্তি ২০০৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

(ক) সাধারণ

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান ঃ চুক্তির ১ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকার পক্ষ হতে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালীদের পুনর্বাসন, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তকরণ, জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান, চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ভূমি বেদখল, বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান, জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে সেটেলারদের অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

❑ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন-করণের বিধান ঃ এই খন্ডের ২ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হলেও এক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বন আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ইত্যাদি আইনসমূহও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিঃ এই খন্ডের ৩ নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য *করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান থাকলেও চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার* পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়নি। উক্ত কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। পক্ষান্তরে চুক্তি লংঘন করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত এ কমিটির ৮ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকগুলোতে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন- ২০০১' এর সংশোধনপূর্বক ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা এবং এলক্ষ্যে ভূমি কমিশনের জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপন; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীন জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্তকরণ; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ হস্তান্তরকরণ, হর্টিকালচার সেন্টার, প্রধান তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ; তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত স্থাপনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান পদে শ্রী সমীরণ দেওয়ানকে নিয়োগ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ ও জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সরকার এই কমিটি প্রদর্শন করে চলেছে।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

❑ সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান ঃ এই খন্ডের ৪ নং ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও কেবলমাত্র তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকরাও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ জারীকৃত এক অফিসাদেশের পর থেকে জেলা প্রশাসক কর্তৃকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। অথচ "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" পরিপত্রে জেলা প্রশাসকের নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা থাকলেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন এখতিয়ার নেই।

উল্লেখ্য যে, জেলা প্রশাসক পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষতঃ চাকুরী, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাগণ চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে এবং অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছে। এক কথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় অনেক বহিরাগত অস্থায়ী অপজাতীয় ব্যক্তি স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহ করে শিক্ষকতার চাকুরী লাভ করেছে।

❑ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ঃ এই খন্ডের ৯ নং ধারা মোতাবেক কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়ণের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। বিগত ২০০১ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ ভোটার বিধিমালা অনুসারে বহিরাগতদেরও তালিকাভূক্ত করা হয়।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ৩৫ নং আইন) করা হয়। আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি।

গত ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর মুখে চূড়ান্তকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর পর তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

❑ পার্বত্য জেলা পুলিশ ঃ এই খন্ডের ২৪ নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

পার্বত্য জেলা পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা আইনগতভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে হস্তান্তর না করায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে জুম্মদের উৎখাত করে ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়ার জোরদার হয়েছে।

❑ ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার ঃ এই খন্ডের ২৬ নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আইন অমান্য করে জেলা প্রশাসকগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। অধিকন্তু আইন অনুযায়ী 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টিও পার্বত্য জেলা পরিষদের একটি বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে এই আইনকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে দোহাই দিয়ে ডেপুটি কমিশনারগণ ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান করে চলেছেন। এই আইন লঙ্ঘন করে তারা ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করে চলেছেন। এর ফলে জুম্ম জনগণ নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন তারা পরবাসী হয়ে পড়ছে। অপরদিকে বনায়ন, গুচ্ছগ্রাম, সেনা ক্যাম্প, গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি জবর দখল করা হচ্ছে।

❑ পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর ঃ জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, কৃষি, স্বাস্থ্য, বন, শিক্ষা, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুব কল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন ইত্যাদিসহ,মোট ৩৩টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ বিষয় এখনো পরিষদে

হস্তান্তর করা হয়নি। বিশেষ করে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর এবং উক্ত চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন সংশোধনের পর কোন বিষয় পরিষদের নিকট হস্তান্তর হয়নি। ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পশু সম্পদ, মৎস্য, সমবায়, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া শিল্প ও বানিজ্যের মধ্যে বাজারফান্ড প্রশাসন ও বিসিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কেবল কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্তুতঃ এখনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উৎসাদির উপর কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করার ক্ষমতা পরিষদসমূহকে দেওয়া হয়নি। ফলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যতঃ ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের মতো অথর্ব হয়ে পড়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের সার্বিক উন্নয়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

❑ **পরিষদের বিশেষ অধিকার ঃ** এই খন্ডের ২৯ নং ধারা মোতাবেক এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করা ও কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার এবং ৩২নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পার্বত্য জেলা পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করা এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান আইনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

❑ **পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ঃ** এই খন্ডের ১ নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হিসেবে কার্যকরকরণের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার দাপটে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আঞ্চলিক পরিষদকে চরম অবজ্ঞা করে চলেছে। বিশেষ করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান একবারও আঞ্চলিক পরিষদের সভায় যোগদান করেননি। এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বিরোধিতা ও অসহযোগিতা করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি, বহিরাগত লোকদের নিয়োগ, সংরক্ষিত কোটা অনুসরণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয়

অধিবাসীদের আপত্তির মুখে জনস্বার্থে আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে তদন্ত করার উদ্যোগ নিয়ে বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আঞ্চলিক পরিষদকে কোন সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন। আইন লংঘন করে সরকারও আঞ্চলিক পরিষদের এই উদ্যোগকে বাতিল করে দেয় এই মর্মে যে পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর আঞ্চলিক পরিষদের তদন্ত করার কোন ক্ষমতা নেই।

❑ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ঃ এই খন্ডের ৯ নং ধারার (খ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভাসমূহও দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে আঞ্চলিক পরিষদকে অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করে যাচ্ছে। ২০০০ সালে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দিলে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হলে রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ বিধানাবলীতে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনী অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

❑ সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান ঃ এই খন্ডের ৯ নং ধারার (গ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে গত ১০ এপ্রিল ২০০১ আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে মর্মে পরিপত্র জারী করার পরও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বিশেষ করে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মহল হতে চুক্তি বিরোধীতাকরণে মদদ থাকায় এবং কর্মকর্তাদের নিজেদের আমলতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে উপরোক্ত আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে চলেছে।

❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন ঃ এই খন্ডের ৯ নং ধারার (ঘ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এসব ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে চরম অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। এনজিও নীতিমালা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতল জেলাসমূহের মত টিএনও ও ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

❑ **উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ঃ** এই খন্ডের ৯ নং ধারার (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার বিষয়টি আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত বিষয় হিসেবে আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও যথাযথভাবে কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জেলা প্রশাসক ও সেনাবাহিনী পাহাড়ীদের সামাজিক বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

❑ **ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান ঃ** এই খন্ডের ৯ নং ধারার (চ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না।

❑ **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ** এই খন্ডের ১০ নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের মধ্যে প্রথম অংশ আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও শেষাংশ আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি। উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান আইনে অন্তর্ভূক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে। বর্তমান সরকারের আমলে এই বিধান লঙ্ঘন করে একজন অউপজাতীয় ব্যক্তিকে (বহিরাগত সেটেলার আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে) নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল আত্মসাৎ করে চলেছে। তারই নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। তার মদদে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন নামে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী ভূঁইফোড় সংগঠন সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উম্মাদনা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসংহতি সমিতি কোন গণতান্ত্রিক কর্মসূচী ঘোষণা করলে এই সংগঠন সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রতিরোধ করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে থাকে।

তারই অংশ হিসেবে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির পূর্ব ঘোষিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে আসার পথে গণফোরাম সভাপতি ও বরেণ্য আইনজীবি ডঃ কামাল হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পাটির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপক খগেশ কিরণ তালুকদার, বাংলাদেশের ওয়াকার্স পাটির অন্যতম নেতা ডঃ আক্তার সোবহান খান মাসরুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গোবিন্দ চক্রবর্তী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের নেতা সাইদুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপর চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সীমান্তে কাউখালী উপজেলাধীন রাবার বাগান এলাকায় চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' ও 'পার্বত্য বাঙালী ছাত্র পরিষদ' নামক উগ্র সাম্প্রদায়িক দু'টি সংগঠনের একদল সন্ত্রাসী পিকেটার কর্তৃক প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ওয়াদুদ ভূঁইয়া তথা খাগড়াছড়ি জেলার চার দলীয় জোটের মদদে জনৈক মাহফুজুর রহমান কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও কয়েকজন ব্যক্তিসহ জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে গত ৮ মে ২০০৪ হরতাল কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালনকালে বান্দরবান জেলা সদরে চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মী এবং নিরীহ পাহাড়ীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। এসময় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরাসহ ৩জন কর্মী হামলাকারীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন। এসময় হামলাকারীরা অগ্রণী ব্যাংকসহ পাহাড়ীদের বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙচুর করে। এর পরপরই হামলাকারীরা পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় ছাত্রাবাসেও হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাট চালায়।

গত ১০ নভেম্বর ২০০৪ ওয়াদুদ ভূঁইয়ার মদদে বান্দরবানে উক্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী সাবেক সংসদ সদস্য ও জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এম এন লারমার ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং জুম্ম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বান্দরবানে আয়োজিত জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কর্মসূচী বানচালের অপচেষ্টা চালায়।

এছাড়া গত ২৬ আগষ্ট ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় স্থানীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালীদের কর্তৃক ৫টি মৌজার ১৪টি জুম্ম গ্রামে মধ্যযুগীয় কায়দায় যে সাম্প্রদায়িক হামলা হয় সেখানেও এই ওয়াদুদ ভূঁইয়ার রয়েছে প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ও মদদ। এই হামলায় তিন শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ীতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়, ২ জন শিশু-বৃদ্ধ খুন ও ১০ জন জুম্ম নারী ধর্ষনের শিকার হয়।

উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কারণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্যবাসী ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ থেকে অচিরেই অপসারণের দাবী করে আসলেও সরকার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

☐ **১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ ঃ** এই খন্ডের ১১ নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের সাথে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের অসংগতি দুরীকরণে সরকার কর্তৃক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

☐ **অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ ঃ** এই খন্ডের ১২ নং ধারা মোতাবেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সনের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বর্তমান চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আঞ্চলিক পরিষদের ৭ জন অউপজাতীয় সদস্যের পরিবর্তে বিএনপি দলের ব্যক্তিদেরকে উক্ত সদস্য পদসমূহে নিয়োগের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বা উক্ত চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ কেবলমাত্র নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। সুতরাং উক্ত বিধান লঙ্ঘন করে উক্তরূপ দাবী পূরণের কোন অবকাশ নেই। ফলে কোন উপায় না দেখে সরকার অতি সম্প্রতি এবহবৎধষ ঈষধঁংবং অপঃ (ঢ ড়ভ ১৮৯৭) নামে ১০৬ বছরের পুরনো একটি আইনকে দোহাই দিয়ে উক্ত ৭ জন সদস্যকে পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন বলবৎ রাখার স্বার্থে উক্তরূপ যে কোন পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে বাধ্য।

☐ **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন ঃ** এই খন্ডের ১৩ নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ করে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার বিধান পরিষদের আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ী জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

❑ উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১ নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থীদের টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া গেল-

মোট প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী সংখ্যা (৬৪,৬০৯ জন)	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	৯,৭৮০ পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তারিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জন

অপরদিকে গত বছর জুম্ম শরণার্থীদের রেশন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে জুম্ম শরণার্থীরা সরকারের এই মানবতা-বিবর্জিত ও জাতিগত বিদ্বেষী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে। অবশেষে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান শরণার্থীদের রেশন প্রদান করা হবে মর্মে অবহিত করেন। বর্তমানে প্রত্যাগত জুম্ম শরণাথীদের রেশন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মাঝখানে এক বছরের ব্যাপী মাত্র অর্ধেক রেশন দেয়। এক বছরের উক্ত বকেয়া অর্ধেক রেশন আজও শরণার্থীরা পায়নি।

অপরদিকে পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সভায় দীঘিনালায় ট্রান্সজিট ক্যাম্পে (সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) অবস্থানরত ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থীকে স্কুলঘর থেকে অন্যত্র অন্তবর্তীকালীন পুনর্বাসনের জন্য সরকার পক্ষ প্রস্তাব রাখে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে তা বিরোধীতা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৬ পরিবার শরণার্থীদের জায়গা-জমি বর্তমানে সেটেলার বাঙালীরা দখল করে আছে। সেটেলাররা দোকানপাট তুলে ভোগদখল করে চলেছে। এমতাবস্থায় সেটেলারদের উচ্ছেদ না করে ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থীদের অন্যত্র অন্তবর্তীকালীন পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিষয়টি আরও জটিলতর রূপ ধারণ করবে বলে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।

□ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১ ও ২ নং ধারা মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকলেও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী সেটেলার বাঙালীদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পার্বত্যবাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনসংহতি সমিতির দাবীর মুখে অবশেষে গত ২৯ অক্টোবর ২০০৪ শ্রী সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করে। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ শে নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো একদিকে যেমন অচল হয়ে পড়বে, অপরদিকে তেমনি পরিস্থিতিকে জটিলতার দিকে ঠেলে দেবে।

□ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত ঃ এই খন্ডের ৩ নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

□ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ এই খন্ডের ৪ নং ধারা মোতাবেক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক বেদখলকৃত জুম্মদের জায়গা-জমি ফেরৎ দানের লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে এযাবৎ পর পর তিনজন (অবসরপ্রাপ্ত) বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেবল চেয়ারম্যান নিয়োগের মধ্যেই ভূমি কমিশন সীমিত থাকে। বস্তুতঃ সরকারের অসদিচ্ছার কারণেই ভূমি কমিশনের কাজ শুরু হতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক একদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও সম্মতি না নিয়ে ১২ জুলাই ২০০১ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' পাশ করে। এই আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে ১৯টি বিরোধাত্মক ধারা সন্নিবেশিত হয়। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময়ে সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনের জন্য ঐক্যমত্য হয়। তদনুসারে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর গত বছর উক্ত

ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু আজ অবধি আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন করা হয়নি। ফলে ভূমি কমিশন কর্তৃক কাজ শুরু করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে ভূমি কমিশনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতীত পরবর্তীতে উক্ত নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ফলে ভূমি কমিশনের সচিব নিয়োগ দেয়া হলেও কমিশনের অফিস স্থাপনের কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি।

☐ **রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ ঃ** এই খন্ডের ৮ নং ধারা মোতাবেক যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। পক্ষান্তরে অনুরূপ জমি বরাদ্দ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবন জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিএনপি'র নেতা জনাব অলি আহমেদের নিকট এরূপ জমি বরাদ্দের ফলে বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের মুরুং জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ২৫০ পরিবার নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন তারা পরবাসী হয়ে পড়ছে।

☐ **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ ঃ** এই খন্ডের ৯ নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা ও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা এবং এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগানোর বিধান থাকলেও সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করেনি। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বাজেট অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করেনি। অপরপক্ষে বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সিংহভাগ অর্থ কর্তন করা হয়।

পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কার্যকর কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি। এমনকি "স্থানীয় পর্যটন" বিষয়টি এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। বর্তমান জোট সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করছে না।

☐ **কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ** এই খন্ডের ১০ নং ধারা মোতাবেক চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য কোন বৃত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

☐ **উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা ঃ** এই খন্ডের ১১ নং ধারা মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পূর্বেকার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

❑ জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান ঃ এই খন্ডের ১৩ নং ধারা মোতাবেক সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পালনীয় সব কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার ঃ এই খন্ডের ১৪ নং ধারায় নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ১৬ নং ধারায় জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে যাচাইবাছাই করে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো ১১৪টি মামলা অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে। এছাড়া সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। সাজাপ্রাপ্ত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। কিন্তু উক্ত আবেদনগুলো বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল–

জেলা	মোট মামলা	প্রত্যাহৃত মামলা	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাঙ্গামাটি	৩৫০	২৮৫	৬৫*
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবান	৩৮	৩০	৮
মোট	৮৪৪	৭২০	১১৪

**সাজাপ্রাপ্ত ৪৩টি মামলাসহ*

অপরদিকে অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে বিধান করা হলেও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। গত ২৫ মে ২০০৪ গুইমারা আর্টিলারী ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুকছড়ি ক্যাম্পের লেঃ কর্ণেল আবদুর রউফ ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাহ্তাবউদ্দিন-এর নেতৃত্বে ১২ ইঞ্জিনিয়ার কোরের একদল সেনা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির গুইমারা অফিস সংলগ্ন বাড়ী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পিসিপি ও যুব সমিতি ১৭ জন কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে মধ্যযুগীয় কায়দায় মারধর করা হয়। গত ২৭ মে ২০০৪ খাগড়াছড়ি থানার ওসি আবুল কালামের নেতৃত্বে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ

যৌথভাবে জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা অফিসে হানা দিয়ে জনসংহতি সমিতির ৩৩ জন নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার করে এবং মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে জেলহাজতে পাঠায়।

❑ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন ঃ এই খন্ডের ১৪ নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে।

পূর্বে চাকুরীতে ছিলেন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে তারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে সরকার জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

❑ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ঃ এই খন্ডের ১৭ নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সেনাবাহিনী, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র সকল অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়ার বিধান থাকলেও তা আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও এখনো চার শতাধিক ক্যাম্প অপ্রত্যাহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে আরো নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। কাউখালী উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়া ও লংগদু উপজেলার রাঙ্গাপানি ছড়ায় সম্প্রতি স্থাপিত দু'টি নতুন ক্যাম্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি গত অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ রক্ষায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি তিন পার্বত্য জেলা থেকে কিছু এপিবি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও উক্ত ক্যাম্পসমূহে পুনরায় সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামেও র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নও (র‍্যাব) মোতায়েন করা হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ২০০৪ র‍্যাব সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি অং শৈচিং মারমাকে আটক করে। অমানুষিক নির্যাতনের পর পরে তাকে ছেড়ে দিলেও একটা সাদা কাগজে তাকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়।

অপরদিকে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে। উক্ত সেনাশাসনের বদৌলতে আনসার, এপিবি ও ভিডিপিসহ সেনাবাহিনী সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে এবং পূর্বের মতো অবাধে গ্রেপ্তার, মারধর, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও নিপীড়ন, ধর্মীয় পরিহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

❑ সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ ঃ এই খন্ডের ১৮ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য

চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভূক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে দাবী জানানো হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখানো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে বহিরাগতরা নিয়োগ লাভ করে চলেছে।

□ **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ** এই খন্ডের ১৯ নং ধারায় বর্ণিত উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য জুম্মদের মধ্য থেকে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে একজন উপ-মন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য এই ধারা মোতাবেক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়নি। অপরদিকে চুক্তি মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ মনিটরিং করা হচ্ছে। Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব ও ক্ষমতা এখনো যথাযথভাবে অর্পণ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে
গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত

আলোচনা সভা

সিরডাপ মিলনায়তন, ১ ডিসেম্বর ২০০৩, ঢাকা

গত ১ ডিসেম্বর ২০০৩ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে 'গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ' ও 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম'এর সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ-এর সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ কামাল। আলোচনা সভায় জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, উন্নয়ন কর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রী রূপায়ণ দেওয়ানের পঠিত প্রবন্ধ এবং সম্মানিত আলোচকবৃন্দের প্রদত্ত বক্তব্য এই অংশে পত্রস্থ করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া[১]

রূপায়ণ দেওয়ান

১। পটভূমিঃ

প্রায় দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংঘাত নিরসনে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই দিবসে প্রতি বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে এবং চুক্তি বাস্ত বায়নের খতিয়ানও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু বিগত ছয় বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় বাস্তবায়িত না হওয়াতে এবং বর্তমান সরকারের চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি ভিন্নভাবে পালন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাছাড়া গত ২৬শে আগষ্ট সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের আক্রমণে মহালছড়ির ১৪টি জুম্ম গ্রামের ধ্বংসলীলা দেখে আসার পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট দাবী রাখেন এবং সেসব দাবী অনতিবিলম্বে পূরণ করা না হলে চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নার্থে আন্দোলন শুরু করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তার এ ঘোষণার পর দুই মাস সময় অতিবাহিত হলেও সরকার কিংবা সরকার দলীয় কোন পক্ষ এ বিষয়ে ন্যূনতম কর্ণপাত করেনি বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে এক চরম সংকটময় অবস্থায় নিয়ে আসা হয় বিভিন্নভাবে। তারই প্রেক্ষিতে তিনদিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলন-২০০৩ শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গত ১৬ নভেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণার কথা দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে অবহিত করে। পরদিন ১৭ নভেম্বর বাঘাইছড়ি উপজেলা মাঠে এক জনাকীর্ণ জনসভায় সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ডিসেম্বরের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অচল করে দেয়া হবে বলেও ঘোষণা দেন। এমনি পরিস্থিতিতে "গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ" ও "বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম" দেশের বিশিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতামত প্রদানের আহ্বান জানালে জনসংহতি সমিতি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তারই সূত্র ধরে আজকের এ মহতী সমাবেশ ও এ প্রবন্ধ উপস্থাপন।

২। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার জুম্ম জনগোষ্ঠীসমূহের একটা পৃথক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস আলাদা সত্ত্বার ও আলাদা শাসন ব্যবস্থার। বিদেশী ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণমুক্ত অস্তিত্বের। মোগল ও ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে বার বার নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখার তাগিদে। মোগলদের সঙ্গে ১৭১২ ও ব্রিটিশের সঙ্গে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার পৃথক জেলা ঘোষণার পরও এ অঞ্চলকে সক্রিয় তত্ত্বাবধানে আনেনি। ১৯০০ সালের ৬ জানুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি, ১৯০০ জারীর মাধ্যমেই এ অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে

---

[১] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'গবেষণা ও উন্নয়ন কালেক্টিভ' ও 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' কর্তৃক ১ ডিসেম্বর, ২০০৩ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে শ্রী রূপায়ন দেওয়ান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যাতে সমতল অঞ্চলের অগ্রসর মানুষদের হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয় তার জন্য এ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যদিও বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের জন্য সমতল জেলাগুলোতে পরিচিত তবুও দেশের রাজনীতিবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আমলাসহ শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার জুম্ম জনগণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না কিংবা যাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে তাদের একটা অংশ সঙ্গত কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতাকে স্বীকার করতে চান না। তারা দেশবাসীকে সঠিক ইতিহাস অস্বীকার করাতে শিক্ষা দেন এবং একটা বিপরীতমুখী ইতিহাস তুলে ধরেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থায় জুম্ম স্বার্থ বিরোধী নীতিমালা রচিত হয় এবং সে ভিত্তিতেই সরকারী সকল কার্যক্রম সক্রিয় হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বিশেষ অধিকারের কথা উঠলেই তারা সংবিধানের শুধুমাত্র নাগরিক সমানাধিকারের বিষয়টার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বলতে চান- কিসের আলাদা অধিকার? প্রজাতন্ত্রের সকল নাগরিকই সমান। তারা এমন ভাব দেখান পার্বত্যবাসীরা যেন রাতারাতি এ সব দাবী উত্থাপন করতে শুরু করেছে। তারা ভুলে যান যে ব্রিটিশ ভারতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আওতাভুক্ত ছিল না এবং সরাসরি দিল্লির গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক শাসিত হতো "শাসন বহির্ভূত অঞ্চল"-র মর্যাদা নিয়ে। বলাবাহুল্য পাকিস্তান সরকারও ঐ বিশেষ শাসন কাঠামো তথা অধিকারকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

৩। সরকারী কার্যক্রমঃ

রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ যাবৎ প্রত্যেকটি সরকার বিজাতীয় চরম ও তীব্র বিরোধী মানোভাব পোষণ করে আসছে। ফলে প্রতিনিয়তই চরম বৈষম্য, লাঞ্ছনা ও জাতিগত শোষণ নিপীড়নের ঘটনা ঘটে আসছে। তাই পাকিস্তান শাসনামলের শুরু থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশকে প্রশাসনিকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অভিযানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়রথ পার্বত্য চট্টগ্রামে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। তা সত্বেও ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে সংবিধান রচিত হওয়ার দিনে জুম্ম জনগণের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়টা অস্বীকার করা হয় এবং পরবর্তীতে নিরীহ জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গণহত্যা ইত্যাদি কার্যকলাপ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বকে কলঙ্কিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদলকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবী থেকে সরে যাবার জন্য কয়েক লক্ষ বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। এমনকি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী অব্যাহত রাখলে আকাশ থেকে বোমা ও গোলা বর্ষণের হুমকি প্রদান করা হয়। তদুদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদম-এ তিনটি সেনানিবাস এবং কাপ্তাই-এ নৌঘাঁটি স্থাপন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান একসময় তৎকালীন নির্দলীয় সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী প্রত্যাহার করতে বলেন। নতুবা তাঁর বন্ধু-সরকার ভারত পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হবে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে পশ্চিম দিক থেকে। ফলে এ যৌথ অপারেশনে এম এন লারমার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের কার্যক্রম স্তব্ধ করে দেয়া হবে। এক দিকে নতুন সরকার বা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ব্যাপক সমতলবাসীর ভূমি

জবর দখলের সর্বাত্মক অভিযান অন্যদিকে পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ চলতে থাকে। ফলে পার্বত্যবাসীদের নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে অনিয়মতান্ত্রিক পথে ঠেলে দেওয়া হয়।

১৯৭৯ সালের গোড়ার দিকে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে গোপনে এক সর্বোচ্চ কমিটি গঠন করে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথ সুপ্রশস্ত করা হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার, উপপ্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দীন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ণেল মুস্ত াফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল আওয়াল, পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আলী হায়দার খান ও ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সামরিক বাহিনীর তত্বাবধানে দুই পর্যায়ে ত্রিশ হাজার সেটেলার পরিবারকে বসতি দেয়া হয় প্রচলিত বিধি ও নিয়ম লঙ্ঘন করে। জেনারেল এরশাদও ১৯৮২ সনে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ের Council Committee on Chittagong Hill Tracts গঠন করে জুম্ম বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সনের ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই কমিটির বৈঠকে ১৯৮৩-৮৪ বর্ষে পনের হাজার বাঙালী পরিবারকে বসতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পরবর্তী সরকারগুলোও এযাবৎ আগাগোড়া জুম্ম বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা দেয়া হয় এবং জুম্ম বিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সাধারণ প্রশাসনকে সহযোগিতার নামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দমনে নিয়োজিত করা হয়। সেনাবাহিনী সামরিক উপায়ে আন্দোলন দমনে পুরো মাত্রায় আস্থাশীল হয়ে সকল প্রকার দমন-পীড়ন ও মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়। আভ্যন্তরীণ পপুলেশন ট্রান্সফার, বিভিন্ন নামে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরী, সমতল থেকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ, ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠে।

৪। শান্তি সংলাপঃ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলন দমনে পুরো মাত্রায় আস্থাশীল হয়ে সকল প্রকার দমন-পীড়ন ও মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের আশ্রয় নিয়েও আন্দোলন দমাতে ব্যর্থ হয়। জেনারেল মঞ্জুর ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি থাকাকালীন সরকার শান্তি সংলাপে আগ্রহ দেখায়। বৈঠকের উদ্যোগ চলে কিন্তু এ উদ্যোগ সরকারী উদ্যোগ কিনা তার আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শনে সরকার সম্মত না হওয়ায় বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৫ সনের ২১শে অক্টোবরের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এক উপসামরিক আইন প্রশাসকের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারী প্রতিনিধিদল স্বীকার করে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানে উভয় পক্ষ ঐক্যমত্যে উপনীত হয় এবং জাতীয় পার্টি সরকারের সঙ্গে ৬ বার, বিএনপি সরকারের সঙ্গে ১৩ বার ও আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ৭বার বৈঠকে বসার পরই ২৬তম বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিঃ

অবশেষে পূর্বেকার দুই সরকারের সঙ্গে শান্তি সংলাপের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহল স্বস্তি লাভ করে। শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে সবাই। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক মহল এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। ইউনেস্কো প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেলিক্স হুপে বোয়ানি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। বিএনপি এ চুক্তিকে কালোচুক্তি ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী দাবী

করে ঢাকা-খাগড়াছড়ি লংমার্চের মাধ্যমে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এসব ঘটনা কারোরই অজানা নয়। চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকারও চুক্তির কিছু বিষয় সীমিতভাবে বাস্তাবায়ন করে অধিকাংশই অবাস্তবায়িত অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখে। চুক্তির কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ফলে ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধান রচনার প্রাক্কালে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অনুসৃত ভুলনীতি সংশোধনের যে সুযোগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পায় তা তারা হাতছাড়া করে দীর্ঘ তিন বছর আট মাস সময়ের শাসনামলে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। ফলে চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার দেশে-বিদেশে যে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে তা একদিকে নিস্প্রভ হয়ে যায় অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরে শেখ হাসিনা সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ থাকলেও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেই চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে ছিল চরম নির্লিপ্ততা ও অসম্মতি। সর্বোপরি আমলা মহলে চুক্তি বাস্তবায়নে কোন আগ্রহই ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তিন জুম্ম সংসদ সদস্যও চুক্তি বাস্তবায়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখেননি মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে তারা মনে করেছিলেন চুক্তি বাস্তবায়িত হলে জনসংহতি সমিতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের নেতৃত্ব কোণঠাসা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ ছিল চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় হলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আস্থা তারা হারাবেন। পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন না। শেখ হাসিনা এসব প্রতিবন্ধকতা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারতেন যদি আওয়ামী লীগ চুক্তি বাস্তবায়নে নির্লিপ্ত না হতো। এটাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে আওয়ামী লীগও চায়নি চুক্তির কিছু বিষয় সে সময় বাস্তবায়িত হোক মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে জনমত চলে যাবে এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল চুক্তি বাস্তবায়িত হলে জুম্ম জনগণ শক্তিশালী হবে তাদের বিকাশ লাভের মাধ্যমে। শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম ভুল ছিল চুক্তি স্বাক্ষরকারী শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে আস্থায় না আনা বা প্রতিপক্ষ হিসেবে নেয়া।

৬। চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থাঃ

চুক্তির কিছু মৌলিক বিষয় লঙ্ঘন করে যে আইন তৈরী করা হয়েছিল জনসংহতি সমিতির তীব্র চাপের মুখে কিছু বিষয় সংশোধন করা হলেও উন্নয়নের অধিকার বিষয়টা এখনও সংশোধন করা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী প্রায় বিষয় আইনে সংযোজন করা হলেও সেসব বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ যাতে কার্যক্ষম হতে না পারে সেজন্য বিধিমালা অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সহযেগিতা পাচ্ছে না আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকেও কার্যক্ষম করার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদেও একজন অউপজাতীয়কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চুক্তির নির্দেশ অনুসারে তিন সদস্যবিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন না করে একটি বিকল্প চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সেনা, ভিডিপি ও আনসার বাহিনীর অস্থায়ী সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার করার কথা চুক্তিতে থাকলেও সরকার প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী মাত্র ৩১টা ক্যাম্প প্রত্যাহারের দালিলিক প্রমাণ জনসংহতি সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেনাশাসন বা প্রশাসনের উপর সেনা কর্তৃত্ব থাকার কথা নয় কিন্তু তা অব্যাহত আছে 'অপারেশন উত্তরণ' (ইতিপূর্বে 'অপারেশন দাবানল') বলবৎ রাখার মাধ্যমে। বিভিন্ন স্থানে চৌকি বসিয়ে সেনাবাহিনীর তল্লাশী, হয়রানি, জিজ্ঞাসাবাদে মানুষ অতিষ্ট। সামরিক অপারেশনে নিরীহ ও অসহায় মানুষের অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। ১৯৯৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে ২৬শে আগস্ট, ২০০৩ পর্যন্ত পাঁচটি জুম্ম এলাকায় সেটেলারদের বড় ধরনের আক্রমণে সেনাবাহিনী নেতৃত্ব

দিয়েছে। ২৬শে আগষ্টের মহালছড়ি এলাকায় পরিকল্পিত হামলাকে বিশ্ব বিবেকসহ নাগরিক সমাজ ও দেশবাসী নিন্দা জানিয়েছে এবং দাবী জানানো হয়েছে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের। সরকার প্রত্যাখ্যান করছে সে সব দাবীর। খাগড়াছড়ির নিরপেক্ষ জেলা প্রশাসককে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক কাজে ব্যবহার করতে না পারায় বিনা বিলম্বে বদলী করে দেয়া হযেছে। সেনা ও সেটেলারের এসব কার্যক্রমের ফলে ধর্ষণসহ অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, জেল-জুলুম, শারীরিক নির্যাতন প্রভৃতির শিকার হচ্ছে অসহায় জুম্ম জনগণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সরকার ও সরকারী দলের চুক্তি বিরোধী অংশ ইউপিডিএফ-কে সক্রিয়ভাবে মদদ দিয়ে সন্ত্রাসী পরিস্থিতি দেখাবার জন্য সক্রিয় রয়েছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠনকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবহার করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই।

ভূমি-বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গঠিত ল্যান্ড কমিশন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখা হয়েছে। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কিংবা আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগই নেয়া হচ্ছে না। ফলে মানুষের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে ও দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুচ্ছগ্রামগুলোতে অবস্থানরত ২৭,৭০২ সেটেলার পরিবারকে ১৯৭৯ সাল থেকেই বিনামূল্যে রেশন প্রদান অব্যাহত রেখে সরকারের বিশেষ মহলের ক্রীড়নকে পরিণত করে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলারদের পুনর্বাসন না দিয়ে জোরপূর্বক জুম্ম জনগণের ভূমি দখলের জন্য তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে সাম্প্রদায়িক হামলার ভয়ে জুম্ম জনগণ সদা উৎকণ্ঠিত অবস্থায় রয়েছে। সেটেলারদের বিনামূল্যে রেশন প্রদান অব্যাহত রেখে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দিয়ে সরকার জাতিগত বৈষম্য প্রদর্শন করছে। আর্মী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, বিডিআর ইত্যাদি বাহিনীর ক্যাম্প ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য জুম্ম জনগণের শত শত একর জমি এখনো বেদখলে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন অজুহাতে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বেআইনীভাবে ভূমি দখলের মহোৎসব চলছে। অতি সম্প্রতি টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দেযা হযেছে কিন্তু দেয়া হয়নি পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। পদমর্যাদা বিহীন চেয়ারম্যান কিভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন? প্রশ্ন থেকে যায় তাকেও কি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের মতো নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে? নাকি জুম্মদের ভূমিতে সেটেলারদের বসতি দেয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হবে?

স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। কিন্তু দীর্ঘ এক দশককাল ধরে চলছে দলীয় মনোনয়ন এবং দলীয় শাসন। ফলে সাধারণ মানুষ যথাযথ উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জেলা পরিষদসমূহ সরকারী দলের নেতৃত্বে থাকার কারণে এগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহল সক্রিয়। জেলা প্রশাসনের বহু ক্ষমতা ও দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদসমূহের এখতিয়ারে এলেও বিভিন্ন যুক্তিতে জেলা প্রশাসন সেসব চরমভাবে অবজ্ঞা করে চলেছে। বাস্তবে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে বহুবিধ-কর্তৃত্বের উপস্থিতি।

সরকার চাইলে একটি টেলিফোন নির্দেশেই এসব বন্ধ করতে পারে এবং পরিষদগুলোকে আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারে। প্রয়োজন সদিচ্ছার। চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র জমাদানকারী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের সঙ্গে মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের সকল প্রকার মামলা, সাজা ইত্যাদি প্রত্যাহারের কাজ সন্তোষজনক নয় এবং বর্তমানে স্তবির হয়ে পড়ে আছে।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সমস্যা কোথায়?

(১) ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ শাসনামলে জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিটি সরকারই খর্ব করে দিয়ে চলেছে। অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সকল সরকারই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র করছে।

(২) জুম্ম জনগণের ভূমি নানাভাবে বেদখলের প্রক্রিয়া।

(৩) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রদান এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র।

জুম্ম এবং বাঙালী জনসংখ্যার অনুপাত:

সাল	জুম্ম	বাঙালী
১৯৪১	৯৮.৫%	১.৫%
১৯৫১	৯১%	৯%
১৯৬১	৮৮%	১২%
১৯৭৪	৭৭%	৩৩%
১৯৮১	৫৮.৬%	৪১.৪%
১৯৯১	৫১.৪৩%	৪৮.৫৭%
২০০৩	৫১%	৪৯%

(৪) সামরিক শাসন "অপারেশন উত্তরণ" অব্যাহত রাখা ও সামরিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের নীতি অব্যাহত রাখা।

(৫) জুম্ম বিরোধী তথা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী আমলাতন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা ও উপজেলায় নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মকর্তা বাঙালী। এসব কর্মকর্তারা বাঙালী স্বার্থের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী পক্ষান্তরে জুম্ম স্বার্থ বিরোধী।

(৬) সুশাসনের অনুপস্থিতি, দুর্নীতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ কর্তৃত্বের উপস্থিতি।

৮। উত্তরণের উপায়ঃ

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বা জুম্ম জনগণকে নিয়ে কি করতে চায় এটা পরিস্কার হতে হবে প্রথমেই। সরকার যদি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে তবে কি পরিমাণ তাও বুঝা দরকার। বর্তমান বিরাজিত সংকট থেকে উত্তরণ সহজেই সম্ভব যদি সরকার তা প্রকৃতই চায়। চুক্তির সব বিষয় বাস্ত বায়ন একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে ৬ বছরেও গ্রহণযোগ্য পরিমাণ বাস্তবায়ন না করার কিংবা বিগত দুই বছর সময়কে "এইতো সে দিন ক্ষমতা নিয়েছি" জাতীয় কিছু বলে যুক্তি প্রদর্শন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিরাজিত সংকট উত্তরণের জন্য এক সংবেদনশীল ও অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পূনর্গঠন করে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা খুবই জরুরী। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা

পরিষদসমূহের প্রবিধান ও বিধিমালাসমূহ অনুমোদন এবং বিষয়াবলী হস্তান্তর করা দরকার। 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহারকরণ অত্যন্ত জরুরী যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তি পেতে পারে এবং সেনাবাহিনী তথা সরকারের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করা জরুরী। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে মুক্ত করা দরকার এবং ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে অপসারণ করে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও একজন যোগ্য উপজাতি ব্যক্তিকে নিয়োগ অতীব জরুরী। উল্লেখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে প্রথমেই আস্থা অর্জনের উদ্যোগ নিতে হবে। আস্থা অর্জনের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়নে নিষ্ক্রিয় থাকে অথবা চুক্তিকে সংশোধনের জন্য সংলাপ শুরু করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৯। রাজনৈতিক দল ও সুধী সমাজের কাছে প্রত্যাশাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং সুধী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এ পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে চুক্তির মাধ্যমে দুই দশকের অধিক রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে সেই চুক্তি লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে বিগত দিনের সংঘাত কাম্য হতে পারে না। তাই সকল রাজনৈতিক দল ও সুধী সমাজকে আজ জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, চুক্তি বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিপালনে এগিয়ে আসতে হবে। তাই তদুদ্দেশ্যে এ আলোচনা সভাতেই আজ সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরী কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে।

ভাষণ

বিচারপতি হাবিবুর রহমান

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ, আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক নানা কনভেনশনে নানা আইন হয়েছে। ১৯৭২ সালে যখন আমাদের সংবিধান হয়, তার আগেও হয়েছে, ১৯৭২ সালের পরেও অনেক কনভেনশন হয়েছে আদিবাসী বা উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। আপাত দৃষ্টিতে আমার মনে হয় না যে আমাদের সংবিধানের সঙ্গে আদিবাসী স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কোন রকম প্রত্যক্ষ সংঘাত নেই। তার কারণ আইনের কাছে সকলের সমান আশ্রয় পাওয়ার অধিকার এবং বিশেষ জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দানের ব্যবস্থা এবং এটা চাকরীর ক্ষেত্রেও সত্য। এই দুটো বিধানের আলোকে যে সমস্ত সমস্যার আমরা সম্মুখীন হচ্ছি তা হয়ত সমাধান করা সম্ভব। যদি সম্ভব না হয় তাহলে পরে আমরা সংবিধান সংশোধনের কথা ভেবে দেখবো। ইতিমধ্যে দ্রুত সংবিধান সংশোধনের যে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে মাত্র একটি দিকের জন্য আমরা দু'বার সংবিধান প্রণয়ন করেছি। সে যাই হোক বর্তমানে আমাদের যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এই চুক্তি সেই চুক্তিকে কেউ সংবিধান বিরোধী বা সংবিধান পরিপন্থী বলেনি। সে চুক্তির বেশ কিছু বিধান, বেশ কিছু শর্ত পালিত হয়েছে, বেশ কিছু শর্ত এখনও পালিত হচ্ছে। এবং তার জন্যে কেউ অজুহাত দিয়েছেন সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে। আসলে এ সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা নেই, সদিচ্ছারও অভাব দেখা দেয়। আমরা আমাদের দেশে ১৯৫৯ সালে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য আইন করেছিলাম। শুধু বাকী ছিল একটাই যে এই আইন অমুক তারিখ থেকে বলবৎ হবে। সেই ১৯৫৯ সালের পর থেকে বহু সরকার এসেছে এবং আমাদের সরকারের দল নির্বিশেষে একটিমাত্র কাজ ছিলো সেটা হচ্ছে তারা শুধু ক্ষমতাকেন্দ্রিক। জনগণকে তারা বিশ্বাস করে না, তারা যেমন বিশ্বাস করে না পার্বত্য চট্টগ্রামের লোককে তেমনি বিশ্বাস করে না বাংলাদেশের ভূখন্ডের জনগণকে। তা না হলে ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থা ছিলো সে জেলা পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোন স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো না। এই খাসনোটের কথা মনে রাখলে আমি মোটেই বিস্মিত হই না যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে স্থানীয় পরিষদের কাঠামো রয়েছে তাকে কার্যকর করার জন্য কেউ কোন উৎসাহ বোধ করবে না। একটা জিনিস অন্তত ভালো লাগলো যে আলোচকবৃন্দের মধ্যে সকলেই এই চুক্তিকে আপন করে নিয়েছে, ইংরেজীতে যে বলে 'উই হেভ ওউন্ড ইট'। তার মানে আমরা একাত্মতা বোধ করছি। আসলে একাত্মতা বোধ করা খুব কঠিন। বিশেষ করে যখন দুটো সমাজের দুটো গোষ্ঠির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের পার্থক্য থাকে। এখানে যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, একটা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'ডেভ্যুলিউশন', ইংল্যান্ডে ডেভ্যুলিউশন করার আগে তাদের রীতিমত নানা কাঠখড় পুড়োতে হয়েছে। স্কটল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স- একজন স্কটিশ লোক সে নিজেকে ইংরেজ বলতে চায় না, তাই বলে ইংলিশ পার্লামেন্ট বলতে পারে না যে, না তোমাকে ইংরেজ বলতে হবে। তারা একটা সমঝোতা করেছে যে, আমরা বৃটিশ। আমাদের দেশেও যখন বাঙালী নামকরণে আপত্তি জানানো হয়েছিল, যে কোন কারণে হোক বর্তমানে সেই কারণ বর্তমান নেই। সুতরাং আমরা নিজেদেরকে বাংলাদেশী বলে এবং বাঙালী তাই বলে চলে যাবে না এবং বাংলাদেশী বলে আমরা আমাদের নাগরিক অধিকারের জন্য এবং নাগরিক পর্যায়ে সমমর্যাদার জন্য আমাদের বক্তব্য আমরা রাখতে পারি। এবং ডেভ্যুলিউশন যে কি কঠিন জিনিস সেটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আদিবাসী রয়েছে তাদের সাথে চুক্তি বিভিন্নভাবে লংঘিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারশ' চুক্তি হয় রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে এবং প্রতিটি চুক্তি মার্কিন সরকার ভঙ্গ করে।

আমাদের দেশে তবু ভালো, যে চুক্তি পালনের কথা বলা হচ্ছে এবং চুক্তি ভঙ্গের কথা বলা হচ্ছে। এবং এইটা আমি বলবো একটা ভালো দিক। আরো ভালো দিক যে আপনারা সকলে মিলে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের মতামত পেশ করেছেন। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সমিতির প্রধান সন্তু লারমার বিরুদ্ধে অস্থিরতার বা অসহিষ্ণুতার কেউ দোষারোপ করবে না। কেউ অভিযোগ করবে না। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি আবার নিবেদন করবো যখন সারাদেশের সাধারণ নাগরিকের অবস্থা খারাপ, যখন ধর্ম নির্বিশেষে লোকের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, যখন ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ মানুষকে নৃসংশভাবে হত্যা করছে, যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতরে পাহাড়ী-বাঙালীর ভিতরে এবং পাহাড়ী-পাহাড়ীর মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে সেখানে আমি আশা করবো যে আমরা অস্থিরতা পরিহার করার চেষ্টা করবো। আমাদের দাবী-দাওয়া পরিহার করবো না কিন্তু অস্থিরতা পরিহার করার চেষ্টা করবো এবং আমি বলবো যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ যে বিচক্ষনতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও বিভিন্ন বাধা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে গিয়ে সেই ধৈর্য্য রক্ষা করবেন এবং তাদের ধৈর্য্যের উপরে আমাদের দেশের শান্তি, আমাদের দেশের স্বস্তি অনেকখানি নির্ভর করছে। আপনাদের, আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আপনাদের এই মহতী অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই।

#

রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ৬ষ্ঠ বছর পূর্তিতে আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, পার্বত্যবাসীদের নেতা শ্রী সন্তু লারমা, প্রধান অতিথি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিচারপতি জনাব হাবিবুর রহমান, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত আলোচকবৃন্দ। আমি প্রথমে আজকের এই ৬ষ্ঠ বর্ষে আর একবার ঢাকাতে পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করার জন্য আদিবাসী ফোরাম এবং আরডিসিকে অভিনন্দন জানাবো। কারন আমরা গত বছর যখন এই আলোচনা করছিলাম তখন একটি কথা বলার চেষ্টা করেছি যে আসলে পার্বত্যবাসীদের এই চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি, এটি কেবলমাত্র পার্বত্যবাসীদের বিষয় নয়, তা আমাদের সবার বিষয়, সমস্ত জাতির বিষয়। এবং সে সময় যে আশংকাটা ব্যক্ত করেছিলাম সে আশংকাটা ছিল এই- যদি এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া থেমে যায় অথবা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পার্বত্যাঞ্চল এবং তার মানুষ বাধ্য হবেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবার আন্দোলনের পথে যেতে। সেরূপ পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ যেমন এই কথা বলেছিলেন আমরাও সে আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। আজকে যখন আমরা আলোচনায় বসছি তখন যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা আমাদের সবার জানা যে আজকে যিনি সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী লারমা, তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন এবং গতকাল তিনি কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন যে এই বর্ষপূর্তিতে আগামী কালই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তারা অবরোধে যাচ্ছেন, হরতালে যাচ্ছেন এবং তারা একথাও বলেছেন যে তারা সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়েছেন যাতে তাদের এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এর আগে মহালছড়ি ঘটনাটি আমাদের সবার জানা, কি ঘটনা সেখানে ঘটেছে, কি নির্মমভাবে সেখানে গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো যে সেটা নিয়ে আমাদের প্রশাসনের যে ভূমিকা এবং সরকারের যে ভূমিকা সেটাও স্বাভাবিকভাবে একজন সচেতন নাগরিককে, পার্বত্যবাসী তো বটেই একজন সচেতন নাগরিকের বিবেককেও কিন্তু নিশ্চিতভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সেই জায়গা থেকে বলবো যে আজকে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি পার্বত্য অঞ্চলে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এই পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্ত

বায়নের কথা বলছি। সুতরাং সেদিক থেকে এই আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসে যদি আজকে এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পথে আমরা কিছুদূর এগুতে পারি তাহলে পরে হলেও অন্ততঃপক্ষে পার্বত্যবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা কিছুটা হলেও আমাদের ভূমিকা রাখতে পারবো। আপনারা জানেন যে, আমি সংসদ সদস্য হিসেবে এই পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলাম। ধুদুকছড়ির গভীর অরণ্যে পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক হয়েছে আবার মাঠেও পার্বত্যবাসীর আন্দোলনে আমি জড়িত ছিলাম। একটু আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বজলুর ভাই বললেন যে ৭০ থেকে যে লড়াইগুলো হচ্ছে সেই সম্পর্কে সচেতন ছিলাম কিনা পার্বত্যবাসীদের সমর্থনের জন্য। পার্বত্যবাসীদের জানা দরকার সেটা হলো যে, জিয়াউর রহমান সাহেব যখন সেই আপামর সামরিকীকরণ করেন এবং সেখানে প্রক্রিয়া শুরু করেন সেই সময় সংসদ সদস্যদেরকে একটি সার্কুলার জারী করেছিলেন যে তাদের অঞ্চলগুলো থেকে যেন পাহাড়ী অঞ্চলে সেখানকার লোক পাঠানো হয়। দেখে দেখে যেন নদীভাঙা লোকগুলোকে বিশেষ করে পাঠানো হয়। আমার মনে আছে সেদিন যারা তরুন সাংসদ, জাসদ এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এর পার্টি- আমরা সেদিন এর বিরোধিতা করেছিলাম। মনে আছে জিয়াউর রহমান সাহেব এর আনা সম্ভবতঃ ১৯৮০ সালে উপদ্রুত বিল, খালি বিরোধীতা করি নাই, বিলের বিরুদ্ধে আমরা হরতাল করেছিলাম এবং আপনাদের যদি মনে থাকে প্রয়াত ফনিভূষণ মজুমদার এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের আক্রমনে আহত হয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টের মধ্যে কালো পতাকা ধারন করেছিলাম এবং আমি আহত হয়েছিলাম। সেদিনই ব্যাঙ্গ করেছিলেন সেই সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান। হাত দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম পার্লামেন্টের মধ্যে। কিন্তু সেই প্রথম কালো পতাকা বিক্ষোভ হয়েছিল। ১৯৮০সালে কাউখালীতে প্রচন্ড গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল সে গণহত্যার পরে আমরা পার্লামেন্টে দাবী করেছিলাম যে গণহত্যার একটা সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক কিন্তু সংসদ সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে রাজী হয়নি। না হওয়ার পরে সে সংসদে ছিলেন উপেন্দ্র লাল চাকমা যিনি পরবর্তীকালে পার্বত্য শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন এবং বিশেষ করে যারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, তিনি, আজকের পরিবেশমন্ত্রী তৎকালীন জাসদ দলীয় সংসদ সদস্য শাহজাহান সিরাজ এবং আমি সাংসদ হিসেবে তিনজন আমরা বেসরকারীভাবে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গিয়েছিলাম। আমরা যখন কাউখালী দিকে দেখলাম মনে হয়েছিল বিভৎস ঘটনা। আমাদের মনে আছে ফিরে এসে বলেছিলাম ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ আমাদের বাঙালীর উপর যে ঘটনা করা হয়েছিল পাকিস্তানীদের দ্বারা। কাউখালী ঘটনাটি তারই এক ধরনের আপনার ছোট সংস্করণ সেখানে দেখেছিলাম। আমাদের মনে আছে একজন সেটেলারকে জিজ্ঞেস করলাম- তোমাদের বাড়ী কোথায়? তো আমার মনে আছে সে তিনবার উত্তর দিল- বাড়ী হচ্ছে বাংলাদেশে। আমি কথা শুনে বুঝেছিলাম তার বাড়ী হচ্ছে বরিশাল এবং আমার নিজের দেশের। আমার মনে আছে একটু থাপ্পর মেরেছিলাম তাকে, শালা তোমার বাড়ী বরিশাল তুই কেন বাড়ী বলছিস বাংলাদেশে? অর্থাৎ তাদেরকে বলানো হচ্ছিল বাংলাদেশী সুতরাং বাংলাদেশের যে কোন জায়গায় তোমাদের থাকবার অধিকার আছে। এই যে মানসিকতা, সেটা এমনই পর্যায়ে যে, আসলে বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে যেতে পারবে না, যে যুক্তিটা বিএনপি জামাত তরফ থেকে বা চারদলীয় তরফ থেকে বা আমাদের অনেক তরফ থেকে এ কথা কিন্তু খুব জোরেসোরে না হলেও অনেক সময় বলা হয়; সেখানে সমস্ত নাগরিকের অধিকার রয়েছে। এই প্রশ্ন কিন্তু এখনও আছে এই যে বাংলাদেশ আমার বাড়ী এই চিন্তাটা তো ঐখান থেকে এসেছিল।

যে কথাটা বলতে চাচ্ছি- সেই সময় থেকে একটা ধারা ছিল, পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে সেই সময় সবসময় বলার চেষ্টা করেছি যে, আন্দোলনটাকে আজকে আমাদের মূল আন্দোলনের স্রোতধারায় নিয়ে

আসতে হবে। এই যে আন্দোলনকে যদি স্রোতধারায় না নিয়ে আসতে পারি, জাতীয় পর্যায়ে যদি আমরা উন্নীত করতে না পারি তাহলে এই প্রশ্নগুলো জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা খুব সহজ হবে। এটা আজকের আনন্দের বিষয়, আমরা বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করেছি যে, আমদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পার্বত্য জনসংহতি সমিতির প্রচেষ্ঠার ফলে আজকের এটা শুভ জাতীয় ঐক্য সবার কাছে এসেছে। আজকের প্রস্তাব রূপায়ন দেওয়ান করেছেন যে, এটা কেবল মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর সমস্যা নয় এটা জাতীয় সমস্যা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা। তিনি প্রশ্ন করেছেন তার ভিত্তিতে সাপোর্ট গ্রুপ বা ন্যাশানাল কমিটি করার আলোচনা করেছি। আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু এই সংবিধান শুধু পার্বত্যবাসীর প্রশ্ন নয় সারা দেশের আদিবাসীরাও সম্পৃক্ত। সেই সংবিধানে আমরা পার্বত্যবাসী অথবা আদিবাসী আমাদের যারা সাঁওতাল রয়েছে এবং সমতলে যারা রয়েছে তাদের অধিকার আমরা সংরক্ষিত করতে পারলাম না, অথচ আমরা যখন আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলি, সংগ্রামের ঐতিহ্যের কথা বলি তখন আন্দোলনের কথা বলি, সেই আন্দোলনে যারা ছিলেন সেই সাঁওতাল কৃষক তাদের অধিকারের কথা কিন্তু বলি না, যখন আমরা আমাদের ঐতিহ্যের কথা বলি তখন আমরা আমাদের দেশের সম্পদের কথা বলি, আমরা কাপ্তাই হ্রদের কথা বলি, আমার কাপ্তাই বিদ্যুতের কথা উল্লেখ করি, হাজার হাজার লোক উচ্ছেদ হয়ে গেছে কেবল এদেশে নয় তারা আজকে অন্য দেশে গিয়ে তাদেরকে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে একথাগুলো কিন্তু আমরা বলার চেষ্টা করি না এবং এর ফলে আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে একটা সাংবিধানিক সংকট রয়ে গেছে। একথাটা বলা হচ্ছে যে আসলে পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রায় সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। একথাটা কিন্তু বলা হচ্ছে বারবার করে। আমি এখানে যে কথাটা উল্লেখ করতে চাই যে এখানে কিন্তু উত্তর রয়েছে আমাদের এই যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি, সাংঘর্ষিক নয় এবং আজকে রূপায়নবাবু বলেছেন যেহেতু একদিনে আসেনি শান্তিচুক্তি, কয়েকটা পর্যায়ে তা এসেছে।

পার্বত্য চুক্তির যে বিষয়গুলো রয়েছে সবগুলো বিষয় নয় কিন্তু তার যে মৌলিক প্রশ্নগুলো, এগুলো কিন্তু আগে আলোচনা হয়েছিল। আজকে রূপায়নবাবু না কেউ বললেন যে, ঐখানে যারা বাঙালী সেটেলার রয়েছেন তারা যে ফিরে আসতে চান। মনে হয় সেসময় প্রস্তাবটা মোটামুটি আলোচিত হয়েছিল এবং ন্যাদারল্যান্ড সরকার ও ডেনমার্ক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যারা ফিরে আসবেন তাদেরকে সেটলমেন্ট করার জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য রাজী ছিলেন এবং আমি আপনাদের সুস্পষ্ট করে জানাতে চাই যে সে সময় আলোচনায় সুনির্দিষ্টভাবে কিভাবে এই সেটেলারদের অন্য জায়গায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া যায়-সেই প্রশ্নগুলো বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল, যদিও কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেনি। যেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা হলো- আসলে যে বললাম ঐ যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। যখন এটা ন্যাশানাল কমিটিতে চলে আসল এখানে আমরা কেউ ছিলাম না এবং রূপায়ন দেওয়ান কারেক্টলি বলেছিলেন ঐখানে যারা ছিলেন তাদের কোন ধারনাই ছিলনা যে সমস্যাগুলো কি? যারা ন্যাশনাল কমিটি, যারা কাউন্সিল কমিটির মেম্বার, দেখা গেল যে বড় বড় মন্ত্রীরা সব নেতারা তাদের ধারনাই নেই যে সমস্যাগুলো কি হচ্ছে। সুতরাং তাদের কাছে জিনিসটা স্পষ্ট ছিল না।

এখানে কতগুলো প্রশ্ন আনতে চাই সেটা হলো যে, যেটা রূপায়ন দেওয়ান এনেছেন, যেমন দৃষ্টিভঙ্গিগত জায়গায় এই সমস্যা দূর করতে, সেটা হলো ভূমি সমস্যা। এই ল্যান্ড কুইশ্চন সমাধান না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান হবে না। এর সাথে জড়িত রয়েছে পার্বত্যবাসী এবং স্থায়ী বাঙালী, এদের অধিকারের প্রশ্ন, পার্বত্য বাঙালীদের অধিকারের প্রশ্ন, পার্বত্যবাসীর অধিকারের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী বিলম্বিত হচ্ছে। এই ভূমির প্রশ্ন কেবল পার্বত্যবাসীর ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বাঙালী অধ্যুষিত যে জনপদ রয়েছে সেখানেও কিন্তু আমরা এই ল্যান্ড কুইশ্চন সমাধান করতে পারিনি। ল্যান্ড কুইশ্চন সম্পর্কে বার বার হাত দিয়েছি কখনো এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারিনি। কারণ এখানে সমস্যা রয়েছে আর পার্বত্য অঞ্চলের প্রশ্নে তো হাত দিতে চান না কারণ এখানে তো

ভূমি গ্রাসী বহিরাগত ব্যাপারটা রয়েছে এবং তার সাথে বনজ সম্পদ। বনের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রাস করার বিষয়গুলো রয়েছে। ঠাট্টা করে বলতাম যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আমাদের আর্মিতে চাকরী পেয়েছেন, তাদেরকে টিমবার জেনারেল বলা হতো অর্থাৎ তাদের কাজ ছিলো গাছ কাটা, ঐ শান্তিবাহিনীর সাথে লড়াই করা না, সেখান থেকে গাছ কেটে নিয়ে আসা। এজন্য তাদের একসময় নাম হয়েছিলো টিমবার জেনারেল, এই গাছ কাটার জন্যই তারা যেন সেখানে ছিল, এই ভূমি কমিশনের ইস্যুটা আমি মনে করি অত্যন্ত জরুরী বিষয়, আমাদের আর একটি বিষয় রয়েছে সেটা হলো যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্যবাসীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো সেখানকার নির্বাচন প্রশ্নটি। কারণ আমি জানি কয়েকদিন পরে পার্বত্য আঞ্চলিক মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং সেখানে দেখা যাবে যে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে যে সেখানে তারা তাদের লোক চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, আমি জানি না এর পরিণতি কি দাঁড়াবে এবং এ ধরণের চিন্তা মাথায় আসে কি না জেলা পরিষদগুলোর। কিন্তু জেলা পরিষদগুলো কার্যকর নয়, কারণ সেখানে নির্বাচন হয় না, সেখানে তাদের লোক তারা বসিয়ে দেন।

আর যেটা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, এই প্রশ্নটা আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এটাও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় উন্নয়ন বোর্ডগুলো হেড হচ্ছেন জেনারেল সাহেবরা এবং এই জেনারেল সাহেবেরা কোটি কোটি টাকা এখানে ব্যয় করতেন। এমনকি পার্বত্য অঞ্চলের স্কলারশীপগুলো, সেই স্কলারশীপ কে পাবেন সেটা নির্ধারণ করতেন জেনারেল সাহেবরা। এখন কি দেখছি আমরা? এখন দেখছি কিন্তু পার্বত্যবাসীর প্রতিনিধির নামে একজন অউপজাতীয় সাংসদকে হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তো এখন হিল ট্রাক্টস-এ চাঁদের গাড়ি চলত আমার জানা ছিল, আমি প্রায়ই শুনি আমাদের মেজর সাহেবরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছেন, তাদেরও অপরাধ আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ আমাদের স্টান্ডার্ড দিন দিন বেড়ে চলেছে। তো সেখানে এই টাকাটা অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকাটা টোটালি ব্যয় হচ্ছে আপনার পার্বত্যবাসীদের অপব্যবহার হিসেবে। তো এই বিষয়টি মনে হয় আমাদের সুস্পষ্টভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন রূপায়ন এবং অন্যান্যরা, তাদের সাথে মোটামুটিভাবে আগেও আমরা ঐক্যমত্যের কথা বলেছি। আমি আবার বলছি যে, সেলিম কথাটা বলে গেছেন, যে আমাদের জাতীয় রাজনীতির সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন এবং তার ভিত্তিতে আমাদের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি। হরতালের কথা আজকে বলেছেন যে আমাদের এই হরতালের মধ্যে পার্বত্য কর্মসূচীর কথা এসেছে, আমি সর্বশেষ যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে পার্বত্য অঞ্চলের আরেকটি বড় সমস্যা এবং আমি সবসময় আলোচনা করতাম সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি। আগে এটা ছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, এখন এটা তার সাথে যুক্ত হয়েছে জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, দুটো মিলিয়ে একত্রে যুক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যাবে যে আজকে সবচেয়ে বেশী তৎপর হচ্ছে জামাতে ইসলামী এবং মৌলবাদী সংগঠনগুলো। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল যে, অন্য একটি আলোচনায় অংশ নিতে যেখানে আমাদের বিভিন্ন জেনারেল সাহেবরা ছিলেন এবং সেখানে জামাতে ইসলামেরও একজন সংসদ সদস্য যিনি আমার সাথে। জামাতে ইসলামি পার্বত্য শান্তিচুক্তি কিভাবে হচ্ছে না হচ্ছে এবং সেই অঞ্চলে তাদের এই যে ধর্মীয়করণ বা ইসলামীকরণ যে প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু বড় বাঁধা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, এটা সম্প্রদায়গত যে বিভাজন সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে সেটার পরিণতি কখনো ভালো হতে পারে না, সেই ব্যাপারটার দিকে আমাদের নজর দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আমি আমার কথা বাড়াবো না- আমি কেবল বলতে চাই এই যে, বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং বহু চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে এই শান্তিচুক্তি আমরা করতে পেরেছি এবং এটা সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে জনসংহতি সমিতিও বলে নাই। আমরাও মনে করি না এটা সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে এবং বলেছি এটা একটা অগ্রগতি এবং একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সেদিকে আমরা অগ্রসর হয়েছি। এই নিয়ে

আমাদের মূল ভূখন্ডে ও আমাদের অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তারা আমাদের সমালোচনা করেছেন। তারা আমাদের বলেছেন যে আমরা এই জায়গায় আপোষ করার কথা বলেছি। আমরা বলেছি যে এটা আপোষ করার কথা নয়, এটা হচ্ছে যে অগ্রগতিটা স্বীকার করা। সেই অগ্রগতি স্বীকার করে নিয়ে একটা পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যদি আমরা অংশ নিতে পারি তার জন্য, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি তাদের যে লড়াই তারা করছেন তার সাথে আমাদের ওয়ার্কার্স পার্টিতো বটেই, এগার দলতো বটে, আমরা আশা করবো যে আমাদের বন্ধু আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিল উপস্থিত আছেন, অতীতের তাদের বিভিন্ন সময়কার কথাগুলো এসেছে অন্তত আজ যাই হোক এখানে তারা ভূমিকা রাখবেন। তবে একটা কথা বলতে পারি যে বিএনপি ও জামাত জোটের পক্ষে ফিরে যাওয়া কিন্তু সহজ নয় বলে তারা যতই চিৎকার করুক যে, তারা এটাকে বাতিল করবে কিন্তু বাতিল করতে পারেন নি, সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি যে বাস্তবায়ন আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বা কর্মসূচী দিয়েছেন তাদের সাথে আমরা একাত্ম আছি; জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দল, এগার দল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল, আওয়ামীলীগের যে বন্ধুর কথা বললাম তারা আছে। অমরা সবাই মিলে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আজকে যদি আমরা, এমনকি বিএনপির মধ্যে যে বন্ধুরা শান্তিচুক্তির পক্ষে অংশ নিয়েছেন, আমিতো এখনও জানি তাদের অংশগ্রহণ ছিল তাদের ভূমিকা ছিল, আজকের সবাই সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাদের মনোযোগের জন্য অশেষ ধন্যবাদ এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে যে আজকে মূল ভূখন্ডের মানুষকে তারা অনেক অনেক বেশী সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন তাদের আন্দোলনে। আমরা সবাই মিলে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবো। সবাইকে ধন্যবাদ।

#

আব্দুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আজকের এই আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি আলোচনা সভার আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, প্রিয় ভাই ও বোনেরা। যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনার জন্য এসেছি, আলোচক বিভিন্ন বক্তাগণ এবং আলোচকদের মধ্যে দিয়ে কথাগুলো প্রায় সবই এসেছে। নতুন করে কথা বলার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তো আমি আমার দল যেহেতু সরকারে থাকাকালীন এই চুক্তি সম্পাদন করেছিল সেই চুক্তি আজকে পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি নাই এবং আজকে যারা ক্ষমতায় আছে তারা সেদিন এই চুক্তির বিরোধীতা করেছিলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে আজও পর্যন্ত এগিয়ে আসছে না, বিভিন্ন তালবাহানার মধ্য দিয়ে এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। আমি তো দাবি করবো যে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে আমরা পূর্ণাঙ্গ সফলতা অর্জন করেছি আমাদের ব্যর্থতা ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল এবং সেই সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে যেতে পারি নাই। কি সেই প্রতিবন্ধকতা ছিল সে কথা আপনারা সবাই জানেন তারপর বলি যে অবস্থায় আমরা যে এ অবস্থানে দাঁড়িয়েছি সেদিন এই চুক্তি বাস্তবায়নের আমাদের বাঁধা ছিল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতা ছিল, সেদিন বাঁধা ছিল আমলাচক্রের জটিলতা এবং বিভিন্নভাবে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র আমরা সম্পূর্ণভাবে ওভারকাম করতে পারি নাই। এটা বাস্তবতা স্বীকার করেই বলি যে আমাদের প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এটাকে বাস্তবায়ন পূর্ণাঙ্গ করে যেতে পারি নাই। আজকের যে অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়েছি সেই অবস্থা থেকে সকলের একটা

ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। জনসংহতি সমিতি আজকে তারা আন্দোলন সংগ্রামের কথা বলছে আমি মনে করি অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি সম্প্রদায় এবং প্রতিটি মানুষের এই আন্দোলন করবার তাদের সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকারের প্রতি আমাদের সবার শ্রদ্ধাশীল থাকা দরকার এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের পেছনে দাঁড়ায় এবং এটা যদি একটা জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করি সবাই যদি এটাকে বাস্তবায়নের জন্য তাদের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হই এবং আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করি আমি মনে করি সরকার যতই ছলচাতুরী করুক এই চুক্তি তারা বানচাল করতে পারবে না এবং চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব করতে পারে কিছু। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার ক্ষমতা কোন সরকারের তো নেই আগামী দিনের কোন সরকারেরও এটা থাকবে না। সুতরাং আমরা আজকে তাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি। আমি একটা জিনিস বলতে চাই আমরা পারি নাই কিন্তু কতগুলো আমরা গ্রহণ করেছিলাম যে পদক্ষেপগুলো এই বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে গিয়েছিল সেগুলো স্মরণ করে দিতে চাই। যেমন ১৯৯৮ সালের ৩রা মে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছিলাম এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আমরা গ্রহণ করেছিলাম। চুক্তি অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির প্রধানকে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, জেলা পরিষদগুলোকে চুক্তি অনুযায়ী পুণর্গঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় আমরা গঠন করেছিলাম, উপজাতীয় সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে পূর্ণমন্ত্রী মর্যাদার দায়িত্ব আমরা দিয়েছিলাম। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের আমরা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধাবস্থা অবসান ঘটেছিল, বিকাল ৪ টার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ বা বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আমরা প্রত্যাহার করেছিলাম, বিদেশীদের যাতায়াত অবাধ করেছিলাম। আওয়ামীলীগ ২৮ জন কাঠুরিয়াকে অপহরণ করে হত্যার পর দুঃখজনক ঘটনা ঘটলেও কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমরা ঘটতে দিই নাই, আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে সেটা সম্ভব হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ আমরা নষ্ট হতে দিই নাই, আমাদের সময় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার, নারী নির্যাতনের মত ঘটনা বন্ধ করেছিলাম, সন্ত্রাসী ঘটনাও কমে এসেছিল, জনগণের জীবনে আমরা শান্তি, স্বস্তিনিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। এখন ঐ অঞ্চলে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো ভূমি সমস্যা। এই ভূমি সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে আমরা ভূমি কমিশন গঠন করেছি এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ আমরা অব্যাহত রেখেছিলাম। সেনাবাহিনীসহ অনেক নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প বন্ধ করেছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের দুয়ার খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য দুই হাজার দুই শত কোটি টাকার একটি প্যাকেজ প্রকল্প প্রণয়ন করে। কিন্তু ২০০০ সালের মার্চে ৩ জন বিদেশীকে অপহরণের ফলে বিদেশীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এতদসত্বেও আওয়ামীলীগ উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে আওয়ামীলীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে অপারেশন উত্তরন নামে একটি বেসামরিক কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছিলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জনসংহতি সমিতি অপারেশন উত্তরনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে এবং প্রতিপক্ষ না ভেবে সেনাবাহিনীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে আওয়ামীলীগে কৌশলগত অবস্থান উপলব্ধিতে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখার কারণে এটা ব্যর্থ হয়ে যায়। আমরা আজকে যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়ে আমি মনে করি যে সময়ের অভাবে আমরা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করতে পারি নাই এবং আমি আগেও বলেছি যে এ বাস্তবায়নে যে বিরোধীতাগুলো ছিল, যে সমস্যাগুলো ছিল এই সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠে আমরা পূর্ণ বাস্তবায়নে যেতে পারি নাই।

কিন্তু ২০০১ সালে ১ লা অক্টোবরের যে কারচুপি নির্বাচনের ফলে দৃশ্যপট কিন্তু আলাদা হয়ে যায়। আজকে বর্তমান জোট সরকার শান্তিচুক্তির বিরোধী ছিল তারা এবং আনুষ্ঠানিকভাকে চুক্তি বাতিল না করলেও তারা যে চুক্তি বাস্তবায়নে উৎসাহিত হবে না এটাই স্বাভাবিক এবং সেটাই তারা আজকে করছে। আজকে একটা জিনিস এখানে বলা হচ্ছে আলাপ আলোচনার মধ্যে যে দু'একটা বুঝলাম যে, মনে হচ্ছে যারা শান্তিচুক্তি করলো শান্তিচুক্তি উদ্যোগ নিল যদি ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে এটা বাস্তবায়নে আমরাই বিরোধীতা করছি, এটা দুঃখজনক ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যারা সৃষ্টি করলো তারা ধ্বংস করতে পারে না। যারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরোধীতা করে তারা ধ্বংসের লীলাখেলায় মেতে উঠে। সুতরাং আমরা সৃষ্টি করেছি এটা শান্তিচুক্তি ক্ষেত্রে এটা আমি বলবো না এটা ধারাবাহিকভাবে এটা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় এসে যে চুক্তিটা করেছে সেটা আমি বলবো না এটা ধারবাহিক প্রক্রিয়ায় সেই এরশাদের আমলে বা বিগত বিএনপি সরকারের আমলে কিছুটা এগিয়ে সেই এগিয়ে আসার ধারাবাহিকতায় আমরা চুক্তিটা পুর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করেছি। এটা অস্বীকার করে যদি এই দাবীদার করি আমার মনে হয় এটা সত্যের অপালাপ হবে এবং আমি সেই সত্যকে অস্বীকার করতে চাই না এবং জাতি এটার স্বাক্ষী। সুতরাং আজকে আমরা যেটা বাস্তবে রূপায়ন করেছি সেটাকে আমি আবার ধ্বংসের লীলাখেলায় মেতে উঠবো এই অভিযোগ যদি আওয়ামীলীগের উপর করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে এটা আওয়ামীলীগের উপর রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসার মানসিকতার এই সব কথা বলা হয় এবং এটা অন্য কিছু নয়। এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এসব কথা এখানে আসে। সুতরাং এই বিষয়গুলো আরও সচেতনভাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, যার যেটা প্রাপ্য সেই প্রাপ্যটা তাকে দিতে হবে এবং সেই প্রাপ্য যদি আমরা দিতে ব্যর্থ হই তাহলে সামগ্রিক ব্যর্থতা কিন্তু আমাদের সবার উপর এসে বর্তাবে, আসল জিনিস ছেড়ে অন্য জিনিসে দৃষ্টিটা অন্যভাবে প্রভাবিত হবে এবং সেই দৃষ্টি অন্যখাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মূল উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই ব্যর্থতার দায়ভার আমি মনে করি আমরা যারা এখানে আছি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, সচেতন মানুষ সেই দায়ভার নিতে রাজি নই। আমরা এই সমস্যার থেকে উত্তরণ পেতে চাই, এই চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতিগত যে সমস্যা সেই সমস্যাকে দূরীভূত করতে চাই। শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ সৃষ্টি একটা শান্তি নিবাস করতে চাই। সেই কারণে আমি মনে করি আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর একটা জিনিস শুধু আমি বলতে চাই যে, শুধু আঞ্চলিক সমস্যা কিন্তু এটা নয় জাতীয় সমস্যা এটা। আমি আগেও বলেছি। সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আমরা সবাই এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসি আমি মনে করি ব্যর্থতার কোন অবকাশ নেই, একদিন না একদিন আমরা সফলতা পাবো এবং সেই সফলতার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশের যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা যারা চিন্তা করি একটা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে একটা শান্তির নিবাস হিসেবে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার দলের পক্ষ থেকে আবারও শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আজকের মত শেষ করছি।

অজয় রায়
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি প্রথমেই আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং গবেষণা উন্নয়ন কালেক্টিভ (আরডিসি)কে আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জানাতে চাই। ইতিমধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে; খুব বেশী কিছু বলার নেই, আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবেই আমার বক্তব্যগুলো আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে চাই।

আমাদের দেশটি খুব ছোট, কিন্তু বৈচিত্রময়। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ তরাইয়ের ঢালু অঞ্চলে চট্টগ্রাম, পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁ। আর পূর্বে যদি আসি তাহলে গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে ময়মনসিংহ এলাকা, নেত্রকোণা। তারপরে জৈয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে সিলেটের টিলাভূমি, তারপরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্যময় এলাকা। এরই মাঝে সমতলভূমি সবুজ বাংলাদেশ। আমরা যখন এই দেশটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, আমাদের প্রবল বাঙালীত্বের চেতনা এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তগুলোর অস্তিত্বকে আমরা মনেই আনিনি। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সাংবিধানিকভাবে এর মধ্যে কোন কনফ্লিক্ট নেই ১৯৭২ সালের সংবিধানে। কেননা ১৯৭২ সালের সংবিধানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারাই বসবাস করবেন তারাই এই বাংলাদেশের নাগরিক। কাজেই আলাদা করে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, চাকমা জনগোষ্ঠির উল্লেখ যদি নাও থাকে তবুও আমি মনে করি যেএখানে নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করার কোন অবকাশ নেই। তার মানে এই নয় যে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অধিকার, তাদের স্বাতন্ত্র্য অধিকারের কথা, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আমরা আদায় করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন ঐ সংবিধানে নেই বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। আমি শুধু এইটুকু বলার জন্যই সংবিধানের কথাটা উল্লেখ করলাম। সংবিধান বিষয়ে আরেকটি কথা বলা হয়েছে। যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি গৃহীত হলো সেটা আদর্শগতভাবে প্রথমে পার্লামেন্টে আলোচিত হলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু সেটি আলোচিত হয়নি যে কোন কারণে হোক। তখন সেটি আলোচিত হলে constitution এর কোন ধারা সঙ্গে এই চুক্তির কনফ্লিক্ট হচ্ছে সেগুলো আসতে পারতো। কিন্তু এতদসত্বেও আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাংলাদেশের সংবিধানকে কোন ভাবে লংঘন করেনি বা স্পর্শ করেনি। কেননা constitution এর একটা ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক এখানে সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য, কোন অবহেলিত মানুষের জন্য special কোন কিছু করা যাবে না। এ কথা পরিষ্কারভাবে constitution এ উল্লেখ রয়েছে। আমি সেই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে দেখতে চাই যে, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য তাদের স্বশাসনের জন্য এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করা হয়েছে সেই ধারা বলে, যে ধারায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে কোন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এরপরে যে আলোচনাগুলো এসেছে তার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি একটি positive পদক্ষেপ, কেননা আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটি বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাস চুক্তি একটি positive বা ধনাত্মক পদক্ষেপ। এটি যদি না করা যেতো তাহলে বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বাধীন ভূখন্ডরূপে অবশ্যই একদিন না একদিন প্রকাশিত হতো। এটিকে যদি আমরা রোধ করতে চাই তাহলে অতি অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে স্বাগত জানালেই হবে না, এর প্রতিটি পদক্ষেপকে বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কতগুলো সুনিশ্চিত, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমেই আমি বলতে চাই, যেটা

ইতিমধ্যে বারবার বলা হয়েছে যে, শুধু সরকারের সদিচ্ছা নয়, এদেশের জনগণের সদিচ্ছা থাকতে হবে এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য। সরকারের সদিচ্ছা কি অসদিচ্ছা এই বিতর্কে না গিয়ে আমাদের বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের সদিচ্ছা আছে কিনা এবং যদি সদিচ্ছা না থাকে, এই সদিচ্ছাতে যাতে রূপান্তরিত করতে পারি অসদিচ্ছাকে, তাহলে এর জন্য একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

এইখান দিয়েই বাংলাদেশের জনগণের সদিচ্ছার প্রকাশ পাবে। সেইজন্য সমতলবাসীদের এই আন্দোলনের সাথে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেটি এখন প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ত্রিশাসন বা চতুর্শাসন ব্যবস্থা চলছে সেটির সম্পূর্ণভাবে অবসানের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যে শাসন বলতে আমি বলছি, আমাদের বাংলাদেশের নিজেদের শাসন, বেসামরিক যে শাসন, তারমধ্যে আমরা স্বীকার করি বা না করি, পার্বত্য অঞ্চলে মূলতঃ সেনাশাসন চলছে; সেটাকে আপনারা যেভাবেই নামকরণ করুন না কেন। এই সেনাশাসনের অবসান হতে হবে। তারপরে ওখানে যে ট্রাডিশনাল শাসনগুলি আছে, যেমন উপজাতীয়দের প্রধান বা রাজা ইত্যাদির মাধ্যমে যে শাসন, যেটিকে লোকাল বা সাংস্কৃতিক শাসন বলা যায়। এই শাসনগুলোকে কতটা রাখা যায়, কতটা রাখা যায় না সেইটিকেও আমাদের বিচার-বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে এবং অবশেষে ক্রমান্বয়ে এই শাসনগুলোর অবসান ঘটাতে হবে; অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিত্বের জন্য অঞ্চলটি যেন শাসিত হয় সেই জন্য। আমাদের ট্রাডিশনাল একটা ভক্তি থাকতে পারে, আমরা আপ্লুত হতে পারি কিন্তু সেই শাসনকে অবশ্যই আমাদের একসময় না একসময় বিদায় জানাতে হবে, সত্যিকারের যদি জনগণের প্রশাসন হয়। আমি আরেকটি কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, যে এককালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটিতে ৯০% এর অধিক মানুষ ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী জুম্ম জনগণ, কিন্তু আজকে এই পরিসংখ্যানে বলা হচ্ছে এটি প্রায় সমান সমানে এসে দাঁড়িয়েছে; ৪৫ ভাগ হচ্ছে বাঙালী আর ৫৫ ভাগ পাহাড়ী। যেভাবেই বাঙালীরা যাকনা কেন, সেটা অসদুপায়ে হোক, সরকারীভাবে সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়ে হোক অথবা স্থায়ী বাসিন্দা বলে যাদেরকে চিহ্নিত করা যায় তাদের মধ্য দিয়ে হোক কিন্তু বাস্তব সত্য হলো যে আমরা population যে balance টা ছিলো সেই balance টাকে আমরা নষ্ট করেছি এবং যে মুহূর্তে এই balance টি নষ্ট করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট তখন থেকেই, সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়েছে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি ব্যক্তিগতভাবে ঐ অঞ্চলটি তিন চারবার ভ্রমন করেছি। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম ১৯৫৬-৫৭ সালে, আমার এক চাকমা বন্ধুর সাথে তার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি রাঙামাটি শহরটি দেখেছি, কি চমৎকার একটি বনজ পরিবেশে সেই ছোট্ট শহরটি ছিলো। ঢুকলেই বুঝা যায় যে, এই জনপদটি এই নগরটি জুম্ম জনগণের। সেখানে দু'একটি ছোট বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেখেছি, ঐ মুদির দোকান, দর্জির দোকান অথবা লবন বিক্রি করে। পাহাড়ী মানুষরা লবন ইত্যাদি তাদের কাছ থেকে কেনে। কিন্তু চিত্রটি ছিল পরিষ্কার, একটি সরল, সাধারণ, শান্তিময় একটি জীবন তারা যাপন করছে। তারপরে আমি যখন ৬০ দশকের শেষে যখন কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রচলিত হয়েছে, তখন আরেক চিত্র, তখন আমি দুঃখে কেঁদেছি। যখন সেই রাজার বাড়ীটি আমি দেখলাম যে কাপ্তাই জলের হ্রদে চাকমা রাজার বাড়ীটি তখনো দৃশ্যমান। হাজার হাজার মানুষকে বিচ্যুত করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট তখন থেকে আরও দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হয়েছে। আমরা জলবিদ্যুতের নামে আমরা হাজারো মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছি এবং এই ঘটনার জন্যে আমরা বাঙালীরা সমতলবাসীরা তখনকার প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছি যে আমাদের উন্নয়নই হচ্ছে, আমরা বিহারের জন্য হ্রদ পেয়েছি, কিন্তু পাছেই যে মানুষগুলো ছিলো তাদের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিনি বা তাদের পুনর্বাসনের নামে আমরা যৎসামান্য যদি করেও থাকি সেগুলো নগণ্য বা তুচ্ছ। তারপরে আমি ১৯৭৫ সালে আরেকবার যাই। তখন গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমি আবার সেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায়

গেছি। আমি একটি বাসে করে যাচ্ছিলাম আমার বন্ধু দু'একজন ছিলেন; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী। রাঙামাটির পথে যেতে যেতে আমাদের একটি জায়গায় আটক করা হলো। আমার পাশে একজন বৃদ্ধ চাকমা ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। দেখলাম যে সেনাবাহিনীর দুইজন উর্দিপড়া লোক উঠলেন। তারপরে তারা বেছে বেছে চাকমা যেসব যুবক ছিলেন সবাইকে বাস থেকে নামতে বললেন। আমার সেই সময়কার পাক অধীনে বাংলাদেশের মানুষের কথা মনে পড়লো, যে আমরা তো একই কাজ করছি! আমি সেই চাকমা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ওদের কি হবে? বললেন যে, ওরা আর ফিরে আসবে না। এই ছিলো তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম। তখন থেকেই আমরা ভাবছিলাম ক্রমশ আমরা হয়ত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটাকে সমাধান করবো রাজনৈতিকভাবে, কিন্তু আমরা পারিনি।

শেষ কথাগুলোতো সবাই জানেন আপনারা, আমরা অবশেষে আওয়ামীলীগ আমলে হোক এই সংবিধান এই চুক্তির মধ্যে দোষ থাকতে পারে ত্রুটি থাকতে পারে, অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু এই চুক্তিটির মধ্য দিয়ে পার্বত্য জুম্ম জনগণের অধিকারকে তো স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটি আমাদের একটি বড় বিজয় বলে আমি মনে করি। এবং এখন যেটি দরকার সেটি হচ্ছে এই চুক্তিটিকে বাস্তবায়ন করার জন্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা হচ্ছে গণআন্দোলন। বোঝাই যাচ্ছে বর্তমানে যে সরকারটি এখানে প্রতিষ্ঠিত এই সরকার এই চুক্তির বিরোধীতা করেছেন, তারা লংমাচ করেছেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং ভোটারদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদি তারা ক্ষমতায় আসেন, তাহলে এই চুক্তিটি বাতিল করবেন। বাতিল হয়ত করা যাবে না, বাস্তবতাকে তারা অস্বীকার করবে না, কিন্তু আমার আশংকা, সেই আশংকাটার কথা বলি যার জন্য আমাদের আন্দোলনের প্রয়োজন, সেই আশংকাটি হলো, যে তারা এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না, যাতে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে এটি একটি এমন স্থিতাবস্থায় তারা নিয়ে যাবে, যাতে চুক্তিটি শতভাবে অকার্যকর বা ineffective হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই অকার্যকরতার পরিস্থিতি নিয়ে পার্বত্যবাসীর মধ্যে দেখা দেবে বিদ্বেষ, দেখা দেবে ঘৃণা, দেখা দেবে হতাশা। এই সুযোগে সরকার হোক, ফান্ডামেন্টালিষ্টদের প্ররোচনায় হোক বা আমরা যারা বাঙালীরা এই আন্দোলনকে বুঝতে পারি না বা এই চুক্তির চরিত্রগুলোকে বুঝতে পারি না, তাদের প্ররোচনায় আবার নতুন করে বাঙালী অভিবাসন শুরু হবে এবং ঐ বাঙালীদের ভেতর থেকেই একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে যাতে এই আন্দোলনের পরে একটা দাবী উঠে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল কর। এখানে বাঙালীদের অধিকার খর্ব হচ্ছে- এই নামে একটি বাঙালী এবং পার্বত্যবাসীদের মধ্যে একটি সংঘাত সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ এই চুক্তির বিরুদ্ধে বাঙালী জনগণ সোচ্চার হবে এবং কিছু বাঙালী যদি সেখানে মারা পড়তে থাকে তখন এই সমতলবাসী বাঙালীদের মধ্যেও একই প্রতিক্রিয়া হবে যে এই চুক্তিটিকে বাতিল করা হোক। আমার কাছে এটিই সবচাইতে বড় আশংকা। এই যে স্থিতাবস্থার মধ্য দিয়ে অকার্যকারিতার মধ্য দিয়ে আবার নতুন করে একটি বাঙালী অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আমি যেটি স্পষ্টভাবে চাই সেটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া, ৯০% এর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে যদি নাও পারি, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের যে প্রকৃতিগত যে বৈশিষ্ট, ethnic যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। অন্তত তাকে সেইখানে ৭০/৮০ ভাগের বেশী যেন অবাঙালী জনগোষ্ঠি থাকে এবং অউপজাতীয় সংখ্যা যেন ৪০ ভাগের বেশী না হয়। এই জন্য যদি প্রয়োজনীয় কিছু আইন প্রণয়ন করতে হয় সেই আইনও প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শুধু এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে নয় ময়মনসিংহের গাড়ো অঞ্চলের সেই ethnic characteristic maintain করতে হবে, সিলেটের খাসিয়া অঞ্চলে, মনিপুর অঞ্চলে ethnic cultural characteristic maintain করতে হবে। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, বগুরা জেলায় সাঁওতাল অঞ্চলগুলিতে যেগুলিতে ক্রমশঃ তাদেরকে দূরীভূত করা হচ্ছে, তাদের ethnic এবং cultural বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য যদি সংবিধানের রক্ষাকবচ জানতে হয়, এ্যাক্ট

প্রণয়ন করতে হয় সেই এ্যাক্টগুলোকে প্রণয়ন করতে হবে। যে হ্যাঁ, বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন জায়গায় আমার অভিবাসন করার বা বসবাস করার অধিকার আছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া এমন হবে না যে কোন বিশেষ অঞ্চলের ethnic population balance নষ্ট হয়, এটিই আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে। এই কথা যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে আমাদের অউপজাতীয় বা অআদিবাসী এবং আদিবাসীদের সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠবো। আমি আমার নিজের অঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর এবং গাইবান্ধা অঞ্চলের আদিবাসীদের অবস্থা ভ্রমন করে দেখেছি। ক্রমশ তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যাচ্ছে, ভারতবর্ষেও যে তারা সুখে আছে তা নয়, কিন্তু এখানকার জোতদারদের অত্যাচারে তারা টিকতে পারছে না। প্রতিদিনই তাদের উপরে হামলা হচ্ছে এবং জায়গা-জমি, মামলা-মোকদ্দমা নানানভাবে তারা নিপীড়িত হচ্ছে। তাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বর এই ঢাকা পর্যন্ত এসে পৌছাই না। আমি এই প্রসঙ্গে একটি অনুরোধ রাখবো আপনাদের কাছে, যে সব বক্তাই বলেছেন যে শুধু আদিবাসী বা পার্বত্যবাসীদের এই সংগ্রাম নয়, এই অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সমতলবাসী বাঙালীদের সম্পৃক্ত হতে হবে। এই জন্য যেটি প্রয়োজন, রাজনৈতিক দলগুলোতো আছেই, পাশাপাশি সুশীল সমাজকে অত্যন্ত তীব্রভাবে বিপুলভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই জন্যে আমি মনে করি ইতিমধ্যে একটি কার্যকর আলোচনার সূত্রপাত হওয়া উচিত যাতে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ঐ ধরণের একটি কমিটি গঠিত হয় সুশীল সমাজ এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যার চরিত্র হবে একেবারে অরাজনৈতিক, কিন্তু এই পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমস্ত আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই কমিটিটি একটি সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে, জাতির বিবেক হিসেবে কাজ করবে। আমরা আন্দোলনে যদি নাও নামতে পারি অন্তত মানবাধিকার বন্ধন করতে, সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদি করতে পারি। অর্থাৎ এই ইস্যু থেকে সরকারের কাছে এবং দেশবাসীর কাছে সচেতনভাবে তুলে ধরার জন্য আমরা পদক্ষেপ করতে পারি। এই পদক্ষেপগুলো হয়তো এই ধরণের একটি জাতীয় যদি কমিটি করা হয় সেই কমিটির মাধ্যমে করা যাবে। এমনকি সুসংগঠিত যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আছে তাদেরকে দিয়েও করানো যাবে না যদি আমরা সবাই মিলে এই আন্দোলনের পশ্চাতে দাঁড়াই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

#

মামুনুর রশীদ
প্রখ্যাত নাট্যকার

শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং আমাদের সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান, আলোচকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী। আসলে আমার যা বলার ছিলো এবং যাদেরকে বলার ছিলো তারা সবাই চলে গেছেন। এবং তাদের পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে এখন কি বলবো এবং এটা বলার কোন অর্থ হবে কিনা জানি না। তো আজকে আমাদের দেশের একটা প্রধান রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক এসেছেন এবং আরও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসছিলেন। অবশ্য রণোভাই (হায়দার আকবর খান রণো) দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে এই কথাগুলো তাদের কাছে পৌছে দেবেন। যদি তিনি দেন তাহলে ভালো হয়। আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন যে প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতারা স্বীকার করলেন এবং এখানেও আমরা সবাই বলছি যে কেন এটা একটা বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে না। এবং আমার মনে পড়ে গত পাঁচটি বছর ধরে শান্তিচুক্তির যে বর্ষপূর্তি হয়, তখন এই বিষয়গুলো আলোচিত হয় এবং এক বছর পরে আবার আলোচনা হয়। এ যেন আমাদের একটা ব্যর্থ নাটকের মত যেখানে শুধু আলোচনা হচ্ছে কিন্তু কোন সংলাপ তৈরী হচ্ছে না। যে রকম বছরের পর একটা না একটা আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। যেটা হওয়া উচিত ছিলো, যেটা দরকার ছিলো এবং অনেক ধরণের

তথ্য আমরা এই বর্ষপূর্তি সভা থেকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক ইস্যু হচ্ছে না। তো বন্ধুবর রূপায়ন দেওয়ান বলেছেন যে সদিচ্ছার অভাব, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, আমলাদের উদার মনোভাবের অভাব। আসলে এই অভাবটা বোধ হয় আমাদের সবার।

বিশেষ করে সংকটতা এমন জায়গা গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই শান্তি চুক্তিকে রক্ষা করা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটা আজো আমরা রক্ষা করতে পারছি কিনা। এই সদিচ্ছার অভাবটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ও বটে। কারন এ দীর্ঘ সময় আমি দেখেছি গত ৫ বছরে এটাকে রক্ষা করার জন্য ও বাস্তবায়ন করার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার দরকার ছিল সেগুলো কিন্তু নেয়া হয়নি । এবং আমার যতটা মনে পড়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ঐ মহালছড়ি ঘটনার পড়ে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম শহীদ মিনারে যে, আমাদের দেশের রাজনীতিরবিদরা করেন টা কি? তারা কি শুধু ভোটের জন্য অপেক্ষা করেন? তাদের কি মানুষের বুঝাবার কোন দায়িত্ব নেই এবং দেখা যায় যে, আমরা একটা শহীদ মিনারে এসমস্ত ভাল একটা সভার আয়োজন করি এবং তারা সদ্য ভাজ ভাঙ্গা একটা পাঞ্জাবী পড়ে এসে সেখানে বক্তব্য দিয়ে চলে যান। কিন্তু সেই রাজনৈতিক দলগুলো একটু ছোট পথসভার ও আয়োজন করেননি বিশেষ করে মহালছড়ি সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলীর পর। তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে, তাহলে কি আমরা এ বিষয়গুলো আলোচনা সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো? পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তি চুক্তি কিন্তু এর আর একটা ভয়াবহ দিক আছে সেটা আপনারা সবাই জানেন যে, তারা সশস্ত্র আন্দোলন করছিলেন , সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের শেষে সে যখন শান্তি চুক্তি হয় তখন তারা অস্ত্র জমাদান করেছিলেন এবং অস্ত্র সমর্পনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে ও হয়েছে। আমরা যখন সেই ৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের পর অস্ত্র সমর্পন করলাম, অমরা অস্ত্র সমার্পন করলাম কিন্তু আমাদের যারা সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রদ্রোহী তারা কিন্তু অস্ত্রগলো তাদের হাতে থেকেই গেল । ফলে আজকে আমরা যে, বিপুল অস্ত্রের বাজার বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রের বাজার নয় । একটা ঘটনা কিন্তু পার্বত্য চট্রগ্রামের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তারা কিন্তু অস্ত্র সমার্পন করেছেন । কিন্তু তাদের যারা বিরোধী এই শান্তি চুক্তি যারা বিরোধী তারা কিন্তু অস্ত্র সমার্পন করেনি। এবং আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি যে,এ অঞ্চলে যারা অস্ত্র ব্যবসায়ী ,যাদেরকে পরবর্তীকালে ও আই সি সেক্রেটারী জেনারেল নমিনেশন ও দেয়া হচ্ছে সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ করেন নি। এবং তারা খুব অস্ত্রকে অত্যন্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন এবং শুধু পার্বত্য চট্রগ্রাম নয় ,সারা চট্রগ্রাম ব্যাপী,সারা দেশ ব্যাপী তারা কিন্তু অস্ত্রে দাপটে একটা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

তা এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে,We shall Over come someday. কিন্তু সেই over come টা কি একশো বছর পরে? আজকের যে, রাজনৈতিক দলের বক্তরা এখানে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ করে আমার প্রশ্ন ছিল জলির ভাইয়ের প্রতি যে, তারা যখন শান্তি চুক্তিটি করলেন, আজকে যখন তারা ক্ষমতায় নেই । শান্তি চুক্তিকে রক্ষা করার জন্যই তো প্রধান ভুমিকা তাদের পালন করা উচিত। এবং এদেশের অন্যান্য যারা প্রগতিশীল শক্তি আছে তাদেরতো এই দায়িত্বটা হাতে তুলে নেয়া উচিত যে,আমরা এটাকে রক্ষা করবো এবং এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য গনআন্দোনে তো তাদের মুখ্য ভুমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু সেই মূখ্য ভুমিকা যদি এখন ঐ সুশীল সমাজের হাতে দেয়া হয়বা সামাজিক শক্তি সমুহের উপর দিয়ে দেয়া হয় তাহলে এটা আলটিমেটলী এক ধরনের আলোচনা হতে হতে আমরা ও কি ক্লান্ত হয়ে যাবো না? একটা আশংকার কথা আমাদের অধ্যাপক অজয় রায় উল্লেখ করেছেন। তো সেক্ষেত্রে আমি যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত নেই তাদের কাছ থেকে এ জবাবটা চাইছিলাম যে, তারা যদি আগামী একশো বছর পরে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন, নাকি এটার কোন আশু পদক্ষেপ নেয়ার আছে। অবশ্যই আমি এটা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সাথে এবং প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারন করতে চাই যে, পার্বত্য চট্রগ্রামের নেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আমাদের সামাজিক শক্তিগুলির উপর সব সময় খুবই জোর দিয়েছেন এবং বার বার আমাদেরকে আলোচনা

সভায় এনেছেন, রাঙ্গামাটিতে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা কতটা করতে পারবো কাজেই ফারুক আহম্মেদ যে কথা বললেন, এটা আমরা বহুবার বলেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি যে, অবিচার আমাদের এই বাঙ্গালীরা করেছেন সেটা যে কিভাবে আমরা প্রতিদান বা এটার কি কি হবে সেটা নিয়ে সত্যি আমরা সবাই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন । তবে আমি এর আগে ও বলেছি যে, অবিচারের একটাসীমা আছে। মহালছড়ি'র আগেও দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উপত্যকায় যদি কোন পাহাড়ী নারী ধর্ষিত হয় এবং ধর্ষিত হবার পরে তার আত্মীয় স্বজন এবং সে যদি কোথাও বিচার না পায় এবং পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে সে লোকটির কাঁধে একটি রাইফেল শোভা পাচ্ছে সেটা পৃথিবীর কোন বিচারে আমার মনে হয় অন্যায় নয়। আমরা সেই অন্যায়ের দিকে আবার কি ঠেলে দিতে চায়? এই প্রশ্নটা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

#

হায়দার আকবর খান রনো
পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সূধীবৃন্দ আমার মনে হয় আরো অনেক আলোচক বৃন্দ আছেন, বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় সন্তু দা কিছু মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন কিছু সময় লাগবে। ফলে যতটুকু সম্ভব ৫/৭ মিনিটের মধে কতগুলো পয়েন্ট কেবল মাত্র আমি স্পর্শ করে যাবো । প্রথমে আমি আমার স্যার প্রফেসর অজয় রায় তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন- ফিজিক্স ডিপার্টমেনেটর । তার একটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বলেছেন যে, বাংলাদেশটি বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময়টি স্বীকার করে নিতে হবে। বাংলাদেশের ভূখন্ডে আমরা যেমন সকলেই সমান অধিকারী এক নাগরিক সঙ্গে সঙ্গে নৃতাত্বিক দিক দিয়ে এখানে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ট বাঙ্গালী হলেও বাঙ্গালী নয় এমন মানুষ আছে এটা স্বীকার করে নিতে হবে এবং কোন একটা বিশেষ অঞ্চলে যদি বিশেষ জাতি দ্বারা অধ্যুষিত একটা অঞ্চল হয় সেই অঞ্চলের জন্য একটা গণতান্ত্রিক নিয়মে বলে, সত্যিকার গণতান্ত্রিক অর্থে বলে সেই অঞ্চলের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যুক্তিসংগত। এটা লেনিনীয় নীতিতেও পারে সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতিতেও পারে। এবং সেই কারনে আমাদের পার্টি, যে পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের মূল বক্তব্য রাশেদ খান মেনন বলে গেছেন।

আমাদের পার্টি ১৯৭৩ সালে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অঞ্চলের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করেছিলাম আমাদের ঘোষণাপত্রে সেটা এখনও অপরিবর্তিত আছে। যাই হোক আর অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে ধরেন আর বিভিন্ন জাতির একসঙ্গে বসবাস যেমন- রাজশাহী অঞ্চলে সাঁওতালও আছে বাঙালীও আছে। সে এলাকা থেকে এ এলাকাটা তাদের আদিবাসীদের একটা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া দরকার এ এলাকাটা ভিন্ন। তো যাই হোক প্রাদেশিক সায়ত্ত্বশাসন বা আঞ্চলিক সায়ত্বশানের কথা গুনে ঘাবড়ে যাইয়েন না। সবাই যে, সায়ত্বশাসনের ব্যাপারে একেবারের ছয় দফা ভিত্তিক হতে হবে ব্যাপারটি এরকম ও নয়। কিন্তু সে অঞ্চলটি বৃট্রিশ আমল থেকে বা তার আগে যে একটি স্বাতন্ত্র্য অবস্থান ছিলো সেটাকে হিসেবে রেখে এবং সে অঞ্চলের মানুষগুলোর যে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সেই থেকে হিসাব রেখে তার স্বাতন্ত্র্যটাকে হিসাবে রেখে সায়ত্তশাসন এটা মোটেই অযৌক্তিকতা নয় কিন্তু সেটা জানা হয়নি এবং সেটা জানতে আমার মনে হয় এখানকার কমই রাজনৈতিক দল আছে বা এমনকি বুদ্ধিজীবি আছেন যা রাজি হবেন। যাই হোক চুক্তি যেটা হলো অনেক ঘটনা সেটা বর্ননা করা দরকার নেই। এখানে বন্ধু রূপায়ন দেওয়ান বিস্তৃতি বর্ননা করেছেন। তা সীমাবদ্ধ সত্ত্বে ও আমরা একটা One step forwarad positive বলে এটাকে আমরা সমর্থন করেছিলাম। আমার কাছে এখন যেটা মনে হয় যে সবচেয়ে Problem সেটা এখানে

দাঁড়াচ্ছে- চুক্তি হলো, বাস্তবায়িত হয়নি- এইতো ঘটনাটা। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এখানে দুটো problem খুবই বড়। একটা হচ্ছে সুশাসনের কথা বলা হচ্ছে। সারাদেমে যদি সুশাসনের ব্যবস্থা সর্ম্পকে যে, প্রশ্ন তা থেকে আরো অনেক গভীর, অনেক ভয়াবহ ব্যাপারটি হচ্ছে এবং গনতান্ত্রিক ব্যাপারটি হচ্ছে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায়। Practically এলে প্রথম থেকে আজ পর্যন্তপার্বত্য চট্রগ্রামে বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে গনতান্ত্রিক পরিবেশ নাই।নির্বাচন কি হয়েছে না হয়েছে সেসব যাওয়ার দরকার নেই সেখানে গনতান্ত্রিক পরিবেশ নাই সেখানে একটা অঘোষিত সেনা শাসন চলছিল এবং এখনো চলছে। চুক্তি বাস্তবায়নের পরেও চলছে। আমিও সেখানে কয়েকবার গিয়েছি। ১৯৫৬ সালে আমিও গেছি। সেদিনের অবস্থাটা কমপ্লিটলী অন্য রকম ছিল যেটা আমাদের স্যার বলে গেছেন। তা পরবর্তী কালেও গেছি। ৮০ দশকেও গেছি, ৯০ দশকেও গেছি, সম্প্রতিও গেছি। আমার মনে আছে একটা বাসে করে আমি যাচ্ছি ঠিক স্যারের মতো যাচ্ছিলাম, বাস থামানো হলো একজন বললো যে, এখানে সবাই বাঙ্গালী অন্য কেউ নাই। তো মিলিটারী অফিসাররা হেসে ছেড়ে দিল। ঠিক একেবারে ৭১ সালের ঘটনাটা ঠিক তার পুনরাবৃত্তি ঐখানে দেখেছি। এবং এটা আজকে আমি বলছিনা। আমার মনে হয় ১৯৮৬ সালে এখানে বিবিসির চেনেল- ৪ এর আমার এক ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল, সেখানে একই কথা বলেছি । Unfortunately ৭১ সালে আমরা পাকিস্তানী দ্বারা যে ব্যবহার পেয়েছিলাম আজকে ঠিক বাঙ্গালীরা ঠিক সেই জিনিষই সেই ব্যবহার করছে পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর। এখানে কিন্তু দুই চারটা সেমিনার করলাম, র‍্যালী করলাম এটা বড় কথা না, এখানে এই নন পাহাড়ী যারা আছেন তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা দরকার , ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। এই সবোনিজম দ্বারা কিন্তু কোন কিছু হবে না এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সংখ্যালগিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর উপর যে নীপিড়ন করে তা সবসময় দেখা যায় সেটা এখানেও আছে এবং খুব ভয়াবহ আকারে দেখা যায়। এখনো আছে। প্র্যাকটিক্যালী মিলিটারী শাসন চলছে।

আমি ক'দিন আগে মাত্র খাগড়াছড়িতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আচরনের যে ব্যাবহার দেখেছি সেনাদের সেটা আসলে সেনা শাসন চলছে বলে মনে হয়। আমাদের অন্ততঃ সবাইকে একবাক্যে, এক জায়গায় আসতে হবে যে, চুক্তিতে যেভাবে আছে যে কয়েকটি ক্যানটনম্যান্ট ছাড়া আর কোন ক্যাম্প থাকবে না। That has been executed. এ ব্যপারে আমাদের সবাইকে দৃঢ়ভাবে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াতে হবে। নেক্সট পয়েন্ট বলে শেষ করবো সেটা হচ্ছে ভুমি সমস্যা। ভুমি সমস্যা বিষয়টি আমার স্যার বলেছেন এক ধরনের কলোনাইজেশন হচ্ছে। ইয়েস, ব্যাপারটি তাই। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সেখানে যাওয়ার অধিকার আছে, যাবো বেড়াবো, বন্ধুত্ব করবো, ঘুরবো, সবই করবো কিন্তু ভুমি অধিকার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ভুমির অধিকার সেটাকে সংরক্ষিত করা দরকার এটা অগনতান্ত্রিক নয় এবং সেখানে যদি সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় দরকার হলে করতে হবে। বিভিন্ন দেশে কিন্তু এটা করা হয়ে থাকে এ রকম ক্ষেত্রে এবং আমাদের সেখানে করতে হবে। এখন অলরেডী সেটেলার পাশ দেয়া শুরু হয়েছে। প্রথমে ৭২ সনে বলা হয়েছিল যে তোরা বাঙ্গালী হয়ে যাও। কন নাই কথা তার পরে ঐখানে বাঙ্গালীদের মেজরিটি করার একটা সুপরিকল্পনা জিয়াউর রহমান শাসনামল থেকে শুরু হয়। তার দ্বারা এখন দেখা যাচ্ছে যে চিত্রতাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এদের রিভার্স করতে হবে। যত কষ্টকরই হোক, যত বেদনাদায়কই হোক এবং এ বাংলাদেশের বিভিন্ন গরীব মানুষকে নিয়ে এসে তাদেরকে দিয়ে খেলার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটার পরিবর্তন করা দরকার এবং একেবারে অসম্ভব বলে আমি মনে করিনা। কারন এখন ওখান থেকে ফিরে আসতেও রাজী আছে অনেকে এবং সেখানে বিদেশী সাহার্য্যও পাওয়া যাবে এরকম কথাবার্তা শুনা গেছে এবং তা কিছু বাস্তব ভিত্তিও আছে। দ্যাট হেজ টু বি ডান। এ দু'টো পয়েন্টে যে অঘোষিত সেনাশাসন চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে এবং এই

সেটেলারদের যে প্রোব্লেমটা তা চুক্তির মধ্যেই সোলিউশান আছে। এ সোলিউশানের দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এবং বাংলাদেশের যে জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য আছে এইটাকে মেনে নিয়ে যদি এগোই তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। তার জন্য পাহাড়ী জনগণ, রংপুরের মানুষ, ঢাকার মানুষ, খুলনার মানুষ, রাঙ্গামাটির মানুষ সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে যদি কোন একটি ফোরাম করা যায় আমার মনে হয় সেটা খুব ভাল হয়। সে রকম ফোরামের উদ্যোগ থাকলে তার সঙ্গে আমাদের পার্টি থাকবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

#

মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি

খালি একটা চুক্তি করলে সেটা কিন্তু শেষ হয়ে যায় না, সেটা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একথা আমরা ভুলে যায় যে, পুরো ব্যাপারটা যেমন নীতি-আদর্শের সঙ্গে প্রশ্ন আছে, এটার সাথে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নগুলো খুবই গভীরভাবে জড়িত। পার্বত্য এলাকার জমি কে দখল করবে এবং বর্তমানে যে ঘটনাগুলো বিশেষ করে জিয়াউর রহমান সময় সুপরিকল্পিতভাবে যেটাকে বলে কলোনাইজেশন, এখানে বাঙালী পাঠিয়ে দিয়ে বাঙালী কলোনী সেখানে দাঁড় করাবে এবং সেটা দিয়ে তাঁরা সেই এলাকার জনগণের অধিকারকে তারা খর্ব করার জন্য চেষ্টা করবে ।

এখানে একটা কঠোর সংগ্রাম অর্থনৈতিক স্বার্থে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। সেখানে যদি অনেক সময় যেটা আমাদের ভুল হয় যে আমরা একটা প্রিন্সিপল এর বিষয় হিসেবে বিষয়টা না দেখে একটা এক্সপেডিয়েন্সি, ইংরেজীতে যেটাকে বলে একটা কোনটাতে সুবিধা হবে, ভোট কোনটাতে বেশী পাবো। কোনটাতে কম পাবো। কোন জায়গা হলে পরে আবার দুটো সিট বেশী পাওয়া যাবে বা একে চটানো যাবো না ওদিকে হলে পরে অসুবিধা হবে। নিশ্চয় নানা রকম কলাকৌশল নেয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা মূল প্রিন্সিপলকে বিসর্জন দিয়ে কলাকৌশল, সেটা কোনদিনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতার দিকটা এই ৬ বছর ধরে চলছে এবং এই সব কথা বাদও দিলাম। কেন না তারাতো পাল্টা মিছিল করেছিল, লংমার্চ করেছিল, তারাতো বলেছিল যে আমরা ক্ষমতায় গেলে পরে এই চুক্তি রাখবো না। কিন্তু আমরা যারা এই চুক্তির পক্ষে সম্ভবতঃ একটু আত্ম অনুসন্ধান করে দেখা উচিত আমি এক পাল্লায় রাখার কথা বলছি না নিশ্চয়। বজলুর ভাইয়ের সাথে আমি এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু এই চুক্তি আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো না? যে আমাদের কি সুযোগ ছিল না? যে এমন কতগুলো পদক্ষেপ নেয়া যেখানে এই চুক্তির বাস্তবায়নটাকে irreversible করার মতো কতগুলো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারতাম। আমাদের যে আঞ্চলিক পরিষদ সেটার কাঠামো যদি সুগঠিত করে তার কার্যক্রম এবং তার সমস্ত অফিসিয়াল সেই সময় তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে যে তাদের রুলসগুলো approve করছেনা, এই পুরো প্রসেস যদি রোলিং এর ভিতরে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে পরে তা আজকের যে এ রকম একটা নাজুক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমাকে আবার নতুন করে এই সংগ্রাম করতে হচ্ছে অন্ততপক্ষে সেই জায়গাটা আমাদের হত না। নিশ্চয় আমরা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবো এবং শিক্ষা গ্রহণ করে সেটা যাতে আগামী দিনে অন্ততপক্ষে আমরা এই ধরনের একটা **গ্যাপ** এর ভিতরে নিজেদেরকে না ফেলে দিই সেই জিনিসটা নিশ্চিত করা অবশ্যই আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি। এখানে যে প্রস্তাবনাগুলো এসেছে যে আমাদের একটা ফোরাম গড়ে তোলা উচিত এই বিষয়টা নিয়ে, এটা আমাদের জাতির প্রোবলেম, সুতরাং জাতির সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়েই আমাদের পার্বত্য এলাকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে সে রকম একটা ফোরাম যদি গড়ে তোলা হয় নিশ্চয় সেটার

সঙ্গে আমরা অংশীদার থাকবো। বিভিন্ন সাপোর্ট গ্রুপ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন ঘটনায় দ্রুত react করে যাতে আমরা সেখানে যেতে পারি, সেটা করতে হবে। বজলুর ভাই যে এখানে সাজেশন বলেছে সেটার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং অনুরোধ করবো সংশ্লিষ্ট সবাই যেন সেই বিষয়টা আরেকটু নজর দেয় যে এটা যেন পারস্পরিক কমিউনিকেশনের জায়গাটাকে যাতে আরও আমরা জোরদার করতে পারি। পরস্পরের জানার জায়গাটা যাতে জোরদার করতে পারি সেটার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেটা এতদসত্ত্বেও আমরা কমিউনিষ্ট পার্টি পক্ষ থেকে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পক্ষ থেকে বলেন ১১ দলের পক্ষ থেকে বলেন আমরা আমাদের নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের পার্ট অব আওয়ার পলিটিক্স, পার্ট অফ আওয়ার পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম এবং সেজন্য আমরা যখন বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করি ঠিক একই রকম জোর দিয়ে আমরা কিন্তু এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সংগ্রাম করবো এবং আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী ১৩ তারিখে যে আমরা হরতাল ডেকেছি সারাদিন ব্যাপী এবং সারাদেশে সেই হরতালের যে সুনির্দিষ্ট দাবীগুলো আছে তার ভেতরে অন্যতম দাবী হচ্ছে যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করণ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কর, মন্ত্রীসভা থেকে রাজাকার অপসারন কর। জঙ্গীবাদী সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক বাহিনী সংগঠনের অপতৎপরতা রোধ কর, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকর, দুর্নীতি নির্মূল কর, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দমন কর, সমাজ ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রুখো, বন্ধ কলখারখানা চালু করো, ছাটাই বন্ধ করো, বিরাষ্ট্রীয়করণ ঠেকাও, মঙ্গাপীড়িত মানুষকে বাঁচাও, ক্ষেতমজুরদের কাজ দাও, কৃষি উপকরণের দাম কমাও, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য দাও, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করো, বস্তি, রিক্সা, হকার উচ্ছেদ বন্ধ করো, গার্মেন্টসহ সকল শ্রমিকের ন্যায্য দাবী মেনে নাও, নারায়নগঞ্জের গার্মেন্টেসের শ্রমিক হত্যার বিচার চাই, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর বিদেশীদের নিয়ন্ত্রনে দেওয়া চলবে না, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার হাত থেকে দেশ বাঁচাও, জামাত- বিএনপি জোট সরকার হটাও। এই দাবীগুলো নিয়ে আমরা হরতাল করছি। আমাদের জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে, বাঁচিয়ে রাখতে হলে পরে এই দাবীগুলো এবং এই রকম দাবীগুলো নিয়েই আমাদের জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। সেটা বাংলাদেশের সমস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্বার্থের ভিত্তিতে আমরা যারা চলছি সমবেতভাবে সেই লড়াই করে আমরা নিশ্চয় একদিন না একদিন আমাদের সব দাবী আদায় করবো। এবং পার্বত্য এলাকার সমস্ত মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চয় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। এই সংগ্রামে আমাদের বিজয় হোক এই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

কমরেড হাসানুল হক ইনু
সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

শ্রদ্ধেয় সভাপতি সন্তু লারমা, আমাদের চার দলের নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধী জনগনের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা প্রথমেই আমি আপনাদেরকেই ধন্যবাদ জানাছি। জাসদের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় আদিবাসী জাতিসমুহের সংগ্রাম অধিকারের আন্দোলন সমর্থন করে আসছি এবং বর্তমানেও করছি ভবিষ্যতেও করবো । আমার ছোটকালের সময়টা পার্বত্য চট্রগ্রামে কেটেছে। সে সুত্রে পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে সর্ম্পক আছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলি পেপার মিল এলাকার বাসিন্দা হিসেবে এবং আমার ছোট বেলায় আমার সঙ্গে সহপাঠি ছিল যারা এক সঙ্গে পড়াশুনা করেছিল ,খেলাধুলা করেছিল এবং যে সময় থেকে আমি জুন্ম জনগনের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত। আমার চোখের সামনে কর্ণফুলি নদী বেঁধে ফেলা হয় এবং তিল তিল করে বাঁধ তৈরি করা হয়এবং যেখানে কাপ্তাই হ্রদের র্সষ্টি হয়। আমি যে ছোট বেলায় লঞ্চে করে চট্রগ্রাম থেকে চন্দ্রঘোনা রাঙ্গামাটি পর্যন্ত যেতাম এবং এই জলপথে চলাফেরা করা অভ্যাস ছিল আমার কিন্তু সব কিছু তলিয়ে যায় এই বাঁধটা তৈরি করার কারনে। তার পর আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি চুক্তি ধরে রাখার জন্য, চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য। চুক্তি বাস্তবায়ন হবে কি না সন্দেহ ছিল চুক্তি হওয়ার পর থেকে । বিগত সরকার চুক্তি রক্ষা করতে চাচ্ছেন না বা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন না সন্তু লারমা প্রথমে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। চুক্তি একটা বিরাট অর্জন, চুক্তি বাস্তবায়ন না করা এই সরকার এবং বিগত সরকারের একটি দুভাগ্যজনক ব্যর্থতা এবং সে ব্যর্থতা সমালোচনা প্রথমে আমি করছি এবং সমালোচনা করে বলছি চুক্তি বাস্তবায়ন করা ছাড়া সরকারের কোন উপায় নাই। আমাদের কোন অবস্থাতে চুক্তি বানচাল করে যুদ্ধে ফেরত যাওয়ার আর সুযোগ নেই। আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই এবং শান্তির পূর্বশর্ত হিসেবে আমরা চুক্তিকে রক্ষা করতে চাই এবং বাস্তবায়ন করতে চাই । আমি আপনাদের বলতে চাই গায়ের জোরে জায়গা দখল করা যায় কিন্তু এলাকা শাসনে রাখা যায় না। তার প্রমান পার্বত্য চট্রগ্রাম। আমরা সাধারন বাঙ্গালীরা গনতান্ত্রিক মনা নেতা কর্মীরা আপনাদের ন্যায্য সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই কলঙ্ক মোছার চেষ্টা করছি। আপনারা ভুল বুঝবেন না এটা বাঙ্গালীর সঙ্গে পাহাড়ী জনগনের কোন যুদ্ধ নয় । এটা বাঙ্গালী শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে পাহাড়ী জনগনের যুদ্ধ ছিল, সেই যুদ্ধে আমরা আপনাদের পক্ষে এবং আপনাদের পক্ষ রেখে দাবীর পক্ষে ছিলাম। সুতরাং হিসাব বুঝে বাঙ্গালীদের এবং পাহাড়ীদের সর্ম্পকের হিসাব বিবেচনা করবেন এই আশা নিয়ে আমি এই আলোচনা সভায় আপনাদের আমি এইটুকু বলবো যে, ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা বা জাতি সত্ত্বা অস্বীকার করা অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং এটা একটা রাজনৈতিক ভুল । ১৭৫৬- ৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জান বক্স খান আপনাদের রাজা বৃটিশদের রাজত্ব মানে নি এবং একাত্তরের বিজয়ের পর মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সেই একি কথা বলার চেষ্টা করেছিলন। ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ৭২ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের সঙ্গে সাক্ষাত করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উনি চারদফা পেশ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই চারদফাকে অস্বীকার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বিরাট নেতা, উনার যে রাজনীতি বিরাজ করছে সেই ভুলের মাশুল বছরকে বছর আমাদের দিতে হয়েছে এবং তার সংশোধন করেছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা চুক্তি সম্পন্ন করে । সকলকে ধন্যবাদ।

নিমচন্দ্র ভৌমিক,
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও

মহাসচিব
বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের

আজকে আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ। প্রথমে আমি আলোচনা সভার আয়োজকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সব সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সমর্থন করে আসছি এবং এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই। এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চাই এই কারণে, আমরা সমঅধিকার এবং সমমর্যাদায় বিশ্বাস করি এদেশের সকল জাতিগোষ্ঠীর। এবং এ চুক্তিও আপনারা জানেন যে, একটা দীর্ঘ সংগ্রামের পরে হয়েছে এবং বাস্তবায়নও আমরা আশা করি। তবে আমরা অস্বীকার করতে পারবোনা আজকে আপনারা অনেক সমস্যার কথা বলেছেন, প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন, এমন কি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছে, যে কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তা আমি বলবো যে, আজকে আমরা সোচ্চার হয়েছি এটা আশার দিক।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও আদিবাসী উপজাতিদের নিয়েই আমরা আমাদের সংগঠনটা করেছি। তার জন্যেই আজকের যে বিষয়বস্তু, এটার সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই সংগঠন ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। আমি বলবো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা আন্দোলন করেছিলেন বলেই, সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন বলেই আজকের এই চুক্তি হয়েছে। সরকার চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই আমি বলবো আমরা যে সংগঠন করছি, আমরা কোন রাজনৈতিক দল নয়, আমরা কোন সাম্প্রদায়িক উপলব্ধি থেকে করছিনা, আমরা আমাদের দাবিদাওয়াগুলো আদায় করার জন্যে এই সংগঠন করছি। আমরা এই দাবিগুলো আদায় করবোই। দাবিদাওয়া না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যা আমি বলবো পাকিস্তানের সময় থেকে শুরু হয়েছে। আমি বলছি, কারণ আমি যখন একবার গিয়েছিলাম ১৯৬৬ সনে, তখন আমি গিয়ে দেখলাম যে আমাকে সার্কিট হাউজে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এবং সার্কিট হাউজের সামনে বিশাল বন, জলাশয়। সেই ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি করবার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেই হ্রদ। জলটা এতই স্বচ্ছ ছিল যে, নিচে আমি দেখতে পারছিলাম সবকিছু। তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, সেখানকার যারা পাহাড়ী ছিল ওরা গেল কোথায়? এর পরে আমি জানতে পারলাম এরা নির্যাতিত নিপীড়িত, জোরজবর দস্তি করে এদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গিয়েও তারা আশ্রয় নিয়েছিল, আমার যা মনে হয়েছিল, পাকিস্তানের সময় থেকেই কিন্তু সেই চক্রান্তটা চলছিল এবং তা আজই চলছে। এটা কি সাম্প্রদায়িকতা? এই যে চিটাগং হিলট্রাক্টস থেকে জুম্মদেরকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছিল।

আজকে আমি যেটা দেখছি এই যে সংহতি সমিতি যেটা করছেন, তাদের আন্দোলনটা কিন্তু ভালো দিকে চলছে। কারণ এটা বুঝতে হবে, এখন সময় হয়তো লাগতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা হলো কি এটা আমাদের না করে উপায় কি। তার জন্যই তো বলছি আজকে আমি যে সংগঠন করছি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, আমরা তাদের সঙ্গে সবসময় থাকবো এবং তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করবো। তবে একটা কথা কি জানেন আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। একটা চক্রান্ত চলছে, আগে থেকে চলছিল, এখনো চলছে, এই চক্রান্ত হলো আমাদের মধ্যে, আপনাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা এবং যাতে এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হয়। তাই আমি অনুরোধ করবো আপনারা নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি শেষ করেন, ঐক্য বদ্ধ থাকবেন এবং আমার যা মনে হয় বাংলাদেশে যারা চিন্তাবিদ আছেন

তারা আপনাদের সঙ্গে থাকবেন। তাই আমি বর্তমান সরকারের কাছে অনুরোধ করছি অনতিবিলম্বে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করেন। আর যদি না করেন তাহলে বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করবে তার জন্য বর্তমান সরকার দায়ী থাকবে। তাই আমি কেবল অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে, আপনারা ঐক্য বদ্ধ থাকবেন, আপনারা আপনাদের আন্দোলন চালিয়ে যান, আপনারা সফল হবেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আমি আমার সংক্ষিত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

#

ড. কাজী ফারুক আহমেদ

সভাপতি, প্রশিকা

সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত আলোচকবৃন্দ। সুধীবৃন্দ। আজ যে প্রসঙ্গ, সে প্রসঙ্গটি অত্যন্ত বেদনাবিধুর। এবং আমাদেরকে আমরা যারা বাঙালী বলি নিজেদেরকে তাদের দু'মুখী moral standard কে expose করে। আমরা যে জিনিসটি আমাদের জন্য চাই, আমাদের ভাষা, স্বাধীনতা চাই, স্বাধীন ভূখন্ড চাই, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চাই, সেটিই আবার অবলীলাক্রমে অন্যদেরকে তার থেকে বঞ্চিত করে। এই দ্বিমুখীতা আমাদের রাজনীতিতে খুব একটা পীড়াদায়ক বিষয় বলে মনে হয় না। এই দ্বিমুখীতা নিয়েই খুব সহজেই অনেকে কিন্তু ঘুমাতে পারেন। তবে এটা আবার সাধারণীকরণ করা যাবে না। অনেকেই আবার বিষয়টি নিয়ে হয়ত সহজেই ঘুমাতে পারেন না। আমাদের যারা মনে করি যে, আমরা উন্নয়ন চাই, দারিদ্র বিমোচন চাই, মানবাধিকার সুরক্ষা করতে চাই, নারীর অধিকার রক্ষা করতে চাই, এইসব বিষয়ই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জাতিগত নিপীড়ন চলছে, এই বিষয়গুলো তার সাথে খুব নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং সে কারণেই ব্যাপক মানবাধিকারের আন্দোলনের সাথে এই জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ করার আন্দোলন কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। অনেকেই বলেছেন যে, এটি একটি আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে না দেখে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা। সেটি কিন্তু কঠিন নয়, এটার একটা বড় যুক্তি রয়েছে। আরও যে যুক্তি রয়েছে সেটা হলো যে, শান্তির মুনাফা। শান্তির মুনাফা শুধু ঐ এলাকার ঐ এলাকার আদিবাসী বা পাহাড়ী তাদের জন্য নয়, এটা কিন্তু আমাদের সমতল অঞ্চলের বাঙালীদের সকলের জন্যই আমরা মান্তির মুনাফাটা পেতে পারি। অতএব আমরা যদি ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাও করি আমাদের কিন্তু শান্তিচুক্তির পক্ষে এবং এর বাস্তবায়নের পক্ষে আমাদেরকে দৃঢ় ভূমিকা নেয়া উচিত। এবং enlightened self interest দিকেও যদি দেখি তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা যাদেরকে যেভাবে treat করবো, আমার প্রতিবেশীকে, তারাও তেমনিভাবে আমাদেরকে treat করবে এবং সেটা হচ্ছে tit for tat। কোন সোসাইটিতে এটা যত বেশী চলতে থাকে সেই সোসাইটি কিন্' ultimately does not forward, it goes backward. অতএব এই ধরণের চিন্তা থেকেও কিন্তু আমাদের একদম মানবাধিকার রক্ষার চিন্তাটা, এত বড় চিন্তা না করেও আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা থেকেও কিন্তু এই বিষয়টাকে দেখতে পারি এবং সেই বিষয়েও আমরা দেখতে পারি যে, শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন নেহাতই জরুরী। আমি একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে বিষয়টিকে সেভাবে দেখতে চাই। উন্নয়নের যতগুলো পূর্বশর্ত দরকার সেই পূর্বশর্তের মধ্যে একটি রয়েছে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। এবং আরেকটি হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র এবং জাতিগত সত্তা নির্বিশেষে একই রকম অধিকার থাকা দরকার। এইটি অবশ্যই আমাদের সংবিধানে আছে। কিন্তু সংবিধানে থাকা আর বাস্তবায়ন করা তো এক কথা নয়। বাস্তবায়ন করতে গেলে যে বিষয়গুলি আমাদের খুব জরুরী বলে মনে হয়, আমি এখানে একটু market principle টা আনতে চাই, যদিও অনেকে তা আপত্তি করতে পারেন।

market principle বলে যে, যে জিনিসের বেশী ডিমান্ড থাকে তার supply ultimately হয়। আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম খুব প্রবলভাবে এবং স্বাধীনতার supply টা এসেছিলো। আমরা যদি সুশাসনের দাবীগুলো জনগণের মধ্যে প্রবলভাবে আনতে পারি তাহলে সুশাসনের supply ও আসতে হবে। এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জাতিগত নিপীড়ন চলছে। সেটা কিন্তু আসলে সারা দেশে সুশাসনের অভাবে যেসব নিপীড়নগুলো চলছে তারই একটি অংশ। অতএব এটা বৃহত্তর সুশাসনের আন্দোলনের সাথে দেখে যদি এই বিষয়টা জনগণের সচেতনতার বৃদ্ধিটাই আমি মনে করি এক্ষেত্রে ডিমান্ড তৈরী করতে পারে। এ কারণে আমরা নাগরিক সমাজ, সেখানে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং অন্যান্য পেশাজীবি সংগঠন রয়েছে এবং আমরা একটা সংগঠন তৈরী করেছি, এটার নাম ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন। আপনারা হয়ত দেখেছেন গত অক্টোবর মাসে আমরা সারাদেশব্যাপী একটা মানববন্ধন করেছিলাম এবং প্রায় ১৫শ' কিলোমিটার মানববন্ধন হয়েছিলো এবং সেই মানববন্ধনের উদ্দেশ্যই ছিলো সুশাসনের দাবীগুলো খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিত করা। সুশাসনের ভিতরে একটি দাবী ছিলো, ১১ দফা দাবীর মধ্যে একটা দাবী ছিলো এটি যে, পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে বাস্তবায়িত করা। এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কতগুলিণ বিষয় ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল যে, আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে যে মনোনীত করার ব্যবস্থাটি রয়েছে যা শান্তিচুক্তিতে নেই, নির্বাচিত করার বিষয়টি রয়েছে সেটি করা হোক। এবং একই সাথে সমগ্র দেশের উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা অর্থাৎ সারা দেশে যে অচলাবস্থায় রয়েছে স্থানীয় সরকারের বিষয়, সেটির সাথে এটি সম্পৃক্ত করে একই বিষয় করে দেখার। অতএব আমরা জনগেণের কাছে এই বিষয়টিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় হিসেবে নিচ্ছিনা এটা সমগ্র দেশের বিষয় এবং তার মধ্যে এটাও একটি বিশেষ বিষয়। অতএব আমি মনে করি এই বিষয়টাকে জনগণের কাছে তাদের সার্বিক স্বার্থের বিষয় হিসেবে যদি উপস্থাপন করতে পারলে আমরা এবিষয়ে অগ্রগতি করতে পারবো।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিটি অনেকটা কাগুজে হয়ে গেছে। এর প্রথমদিকে কিছু কিছু বাস্তবায়িত হলেও পরবর্তীতে এমনকি আওয়ামীলীগের সময় খুব মন্থর হয়ে গিয়েছিলো, একদম এগুইনি। আর এই সরকার আসার পরে যদিও তারা বলছেন না যে, এটা আমরা বাতিল করছি কিন্তু কার্যত তারা এটা পাশ কাটিয়ে সমস্ত কিছু করে ফেলছেন। সেই দিক থেকে আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য হতে হবে যে এর বাস্তবায়ন করাটা এবং সেই বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে একটি বিষয় আমি খুব গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি। কাঠামোগত বা প্রশাসনগত যে বিষয় রয়েছে তার থেকেও যে বিষয়টিকে আমি জরুরী মনে করছি সেটা হলো ল্যান্ড কমিশনকে কাজ করানো এবং তার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যত জটিলতা হয়েছে সেগুলোর নিরসনের ব্যবস্থা করা। এখন শুধুমাত্র আমাদের আন্দোলনে এটি হবে সেটা বলা যায় না এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততা আমরা এখানে চাই। আজকে যারা রাজনৈতিক দলের বক্তা ছিলেন তারা এটাকে সমর্থন করেছেন। এবং তারা বলেছেন যে আগামীতে যে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো হতে যাচ্ছে তার মধ্যে এই বিষয়টিও তারা সম্পৃক্ত করেছেন, এটি কিন্তু খুব আশার কথা। আর আমরা নাগরিক সমাজ থেকে যে আন্দোলনগুলো করছি বা ভবিষ্যতে করবো সেখানে আমাদের সুশাসনের বিষয়ে যত দাবী থাকবে সব দাবীগুলোর মধ্যে এটিও একটি প্রধান দাবী থাকবে। সেইজন্য আমরা এখানে যে সাপোর্ট গ্রুপের আইডিয়াটা করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এধরণের যদি সাপোর্ট গ্রুপ গঠন করা হয় আমরা এতে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

আমি সর্বশেষে যেটা বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ অর্থাৎ পাহাড়ী যাদেরকে আমরা বলি বা অনেক সময় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বলি। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। কিন্তু অনেক সময় ক্ষুদ্র বলতে এর সাথে নেগেটিভ একটা সেন্স চলে আছে। তো যাই হোক মাঝেমধ্যে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে এসব ব্যবহার করতে হয়। আমি আমার প্রতিষ্ঠান, প্রশিকা, এডাব এবং ঐক্যবদ্ধ নাগরিক

আন্দোলন, আমি সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ আন্দোলনের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং আমার পূর্ণ সমর্থন এবং আমার সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থন মানেই শুধু কথায় সেটি থাকবে না, আমরা চেষ্টা করবো কাজে। এবং সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ণ সংহতি জানানোর উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করবো। আপনাদের আন্দোলন সফল হোক এবং এই আন্দোলন সফলতার মাধ্যমে আমি মনে করি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, বাঙালীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। আমরা যদি আপনাদের সাথে থাকি আমাদেরই বরঞ্চ কিছু লাভ হবে যে then we will be able to prove ourselves that we are little bit better human being. যেভাবে আমরা এখন আচরণ করছি তার তুলনায় আমরা একটু ভালো করতে চাই এবং আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে আমাদের আদর্শিক সাবলিলতা ছিলো অর্থাৎ we wanted to be a better human person এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের কার্যকলাপ আমাদের better human person থেকে আমাদেরকে Degraded করেছিল। তো সেই Degradation থেকে মুক্তি পেতে আমরা চাই। এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা যে একটি humanistic society আমরা তৈরী করতে চয়েছিলাম, সেখানে আমরা ফিরে যেতে পারবো। অতএব আমাদের অনেকটা পাপমুক্তি হবে বলে আমি মনে করি এবং তো সেই কারণেও আমি আমি আমাদের প্রতিষ্ঠান, অনেকে আমরা এতে সম্পৃক্ত আছি হাজারে হাজারে। আমরা সকলে খুব সক্রিয়ভাবে এতে কাজ করবো, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

#

সাদেকা হালিম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

ধন্যবাদ সঞ্জীব দ্রং । আমি আসলে প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসিনি বক্তব্য দেয়ার জন্য। তবে আমার মামুন ভাইয়ের মতো বলতে ইচ্ছে করছে। আমার মনের মধ্যে কয়েকটা কমেন্ট ছিল। কিন্তু সেটা আমাকে পরিত্যক্ত চেয়ারের উদ্দেশ্যে বলতে হবে। প্রথম যেটা চলে আসছে আজকে আলোচনায় এসে প্রধান অন্তরায়গুলি কি সেটা বিশদভাবে আলোচনা হয়ে গেছে। রূপায়ন দেওয়ানের প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে আমরা সেটা জানতে পেরেছি। এবং আর একটি কথা আমার আজকে বার বার মনে পড়ছে যেটা লারমা স্যার প্রায় বলে থাকেন যে, "আমি কোন দলের সাথে চুক্তি করিনি, আমি সরকারের সাথে চুক্তি করেছি।" কিন্তু আজকের আলোচনায় যেটা বের হয়ে আসছে যে, কোন সরকারই আসলে কোন দলের উর্ধে নয়। তারা যে রাজনৈতিক দল যখন পাওয়ারে আসছে তাদের ইচ্ছাগুলো কিন্তু পলিসি লেবেলে/ প্রোগ্রাম লেবেলে এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে আমরা দেখছি যে, সেটা বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই চুক্তি বাস্তবায়নের যে ব্যাপারটা আজকে সারাদিন ব্যাপী যে আলোচনা করা হলো এটা আসলে একটা রাজনৈতিক ইস্যু। এবং রাজনৈতিকভাবে হয়তো এর সমাধান নিয়ে আসতে হবে। আমি রাজনীতিবিদ নই। যেখানে অনেক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। হয়তো তারা কেউ কেউ দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। আমরা ফাইনালী স্যারের বক্তব্য শুনবো। সেখান থেকে হয়তো বা আমরা নিজস্ব একটা ধারনা নিয়ে আজকে বাড়ী ফিরতে পারবো যে আসলে কি হবে, আমরা কি আবার নেক্স ইয়ারে এখানে না হলে আর একটা ভ্যানুতে বসে একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করবো কিনা? এখন আমি কয়েকটি কমেন্টে যেতে চাই- একটা হচ্ছে যে একজন বক্তা সম্ভবতঃ বদরুজ্জামান সাহেব উনি বলেছিলেন যে, ওখানে সেটেলার বাঙালী আছে। বিষয়টা কিন্তু বারবার আসছে। আমি যেহেতু একজন শিক্ষক, তাই বিষয়টা আমাকে নাড়া দিয়েছে- বাঙালী না সেটেলার, কিভাবে আখ্যায়িত করা হবে তাদের ওখানে। যেটা প্রায়শই আমরা গবেষণাপত্রে দেখতে পাচ্ছি হিলট্রেক্টের

উপরে এবং হিলট্রেক্টের যারা আদিবাসী লেখক উনারা কিন্তু বলেছেন যে, আদি ও স্থায়ী বাঙালী এবং সেটেলার বাঙালী। এটা আমাদের কিন্তু ক্লিয়ারলি একটা ডিসটিংকশন আছে। তাহলে কে খারাপ বাঙালী আর কে ভাল বাঙালী এটা বেছে বেছে চাল বাছার মত বাছা আমার মনে হয়না সম্ভব এবং এটা খুব রিলেটিভ ব্যাপার। আপনার দৃষ্টিতে যে খারাপ সেটা আর একজনের দৃষ্টিতে ভালও হতে পারে। এখানে কিন্তু এ বিভাজনটা অনেক আগে হিলট্রেক্টে এটা হয়ে গেছে। আর একটা বিষয় এসেছে আমার একজন শ্রদ্ধাভাজন প্রফেসার অজয় রায় উনি বলেছেন যে, চীফ সিস্টেম অর্থাৎ চীফ, হেডম্যান, কার্বারী এগুলো ঠিক বিলুপ্তি করা উচিত এবং জনগণমুখী করা উচিত। আমার মনে হয় যে, ধারনাটা উনি দিচ্ছেন এখানে যারা গবেষণা করছেন হিলট্রেক্টে মূলতঃ প্রশাসন নিয়ে, রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে। সেখানে একটা লেখা এবং যে বইটা মেজবাহ্ কামালের সামনে আছে সেখানে লেখাতে এসেছে যে, হিলট্রেক্টে একটা দ্যুয়েলিসটিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। লেখক নিজেই প্রশ্ন করছেন- আসলে হিলট্রেক্ট চালায় কে? সেখানে সিভিল প্রশাসন আচে, রাজারা আছেন, আঞ্চলিক পরিষদ আছে, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আছেন। তো আসলে কে হিলট্রেক্টসকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন? এখানে আর একটা আরগুমেন্ট হচ্ছে যে, যেটা আমরা শুরুতেই শুরু করেছিলাম যে বাংলাদেশকে আমি বৈচিত্র্যের দেশ বলে বলি সেটা শুধু নদী-নালা, খাল-বিল, দিয়ে না বা ধর্ম দিক দিয়ে না, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এখানে বাস করে বা বিভিন্ন জাতি হিসাবে শুধু না আমি বলবো প্রশাসনের দিক দিয়েও। যদি সেখানে এক প্লুরেলিজম থাকে সেটা ক্ষতি কি? এবং সেটা নিশ্চয় আপনারা ভেবে দেখবেন যারা আদিবাসী হিলট্রেক্টস থেকে আসছেন। যে প্লুরেলিজমটা কি আপনাদেরকে হাত শক্ত করছে, চেক এ্যান্ড ব্যালেঞ্চ দিচ্ছে- আপনারা একটা একক ব্যবস্থা নিতে যাচ্চেন। সেটা আমার মনে হয় আরো বেশী ভেবে দেখার বিষয়। আর দু'তিনটা বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই। একটা হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে। এখন আমি সেই উদাহরণগুলোতে যাচ্ছিনা। আমি বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে উন্নয়নের সাথে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে আমি হিলট্রেক্টে খুব জড়িত এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি যেটা দেখছি যে, উন্নয়নের নামে আসলে একটা নিপীড়ন চলছে এবং সেই নিপীড়নটা পরে সিড়ি সেষ্টে ল্যান্ড, ল্যান্ড ইস্যুতে বলেন এবং আর একটি ইস্যু এখানে আসেনি। সেটা হচ্ছে যে, দাতাগোষ্ঠীরাও তাদের ইচ্ছাগুলো চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। সেটা কি নিপীড়ন নয়? এবং আমি

যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনজিওগুলোর সাথে কাজ করি, তখন যে তথ্যটা সবচেয়ে বেশী বের হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যে, একটা হচ্ছে ডোনাররা তাদের ইচ্ছাগুলো চাপিয়ে দিচ্ছে। তার পরবর্তীতে যেটা আমি আলোচনায় আসবো- সেটা হচ্ছে নারী বিষয়টা। সেখানে মামুন ভাই একটু টাচ করেছেন। এ বিষয়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সারাদিন আলোচনায় বেশ উন্মুখ হয়ে বসেছিলাম যে, এখানে হয়তো নারী বিষয়টা আসবে। কিন্তু সেটা সেভাবে আসেনি। এখান থেকে আমি সংবিধানকে নিয়ে আসি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশে যদি সমতলের নারীদেরকে বলা হয়েছে হ্যাঁ আপনাদের সমঅধিকার আছে যারা সমতলের নারী। আমরা জানি যে, আমরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সেই অধিকারের জন্য এখনো আমরা স্ট্রাগল করছি। আর নারীকে ক্ষমতায়ন করতে হবে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব অপচ্ছন্দ করি। কারন আমি মনে করি সব নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে গেছে শুধু তাদেরকে সুযোগটা দেয়া হচ্ছেনা। আদিবাসী নারীরা নির্যাতিত। আজকে যে ধরনের আলোচনা হলো- " সামরিক শাসন" বিষয়ে - হিলট্রেক্টে একটা পৃথক শাসন চলছে সেটা হচ্ছে- সামরিক শাসন। এবং এই নারীরা আমি সম্প্রতি একটা গবেষণা করেছি এ্যাডভোকেট রাজিব ও এ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমার সাথে। সেখানে আমরা যে তথ্যগুলো নিয়ে এসেছি নিপীড়ন-নির্যাতনের ধারাটা কিন্তু এখন চুক্তি পরবর্তীতে '৯৭ এর পরে ধারাটা কিন্তু বদলে গেছে। আগে সেটেলার গ্রামগুলো ছিল কয়েকটা জায়গায়, এরা সবাই ছড়িয়ে গেছে। নারী নির্যাতনটা এখন ব্যাপকভাবে হচ্ছে এবং বিভিন্ন ফর্মে হচ্ছে। তারা কোন জায়গাতে কিন্তু সুবিচার পাচ্ছেনা এবং এ বিষয়ে আমি অনেকবার লারমা স্যারের সাথেও কথা বলেছি।

উনি বলেছেন- এটা চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। অর্থাৎ নারীদের যে ইস্যুগুলো আছে হিলট্রেক্টে সেটা চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। তবে আমি এখানে একটু ভিন্নমত পোষণ করি। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় নারী নির্যাতন তো কমবে না বরঞ্চ বাড়বে। উন্নয়নের নামে যে নিপীড়ন চলছে আপনাদের সবার উপরে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে এবং লোক্যাল যে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াতে চাচ্ছে তাদের উপরে। তাদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছেনা, তাদের উপর কড়া নজরদারী করা হচ্ছে। সেগুলো কিন্তু এ প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি নিয়ে আসা প্রয়োজন। আরো আমি মনে করি যে, জেন্ডার সেল আঞ্চলিক পরিষদে হওয়া উচিত। এখানে একটা রেকর্ড থাকবে। এরা যেভাবে পারেন না কেন সেভাবে মেয়েগুলোকে সাহার্য্য করা যেতো। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবোনা, শেষে আমি আরো একটু খুশী হতাম আজকে যারা অনুষ্ঠানের আয়োজক আরডিসি এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এখানে যদি কিছু মহিলা থাকতেন আজকে বক্তা হিসাবে। আমি একাধারে উয়িট ডিউ রেসফ্যাক্ট আমি মনে করি যে, আদিবাসী নারীরাও আছেন, নারীনেত্রী আছেন, তাদের তো আশা করবো যে সামনে যে অনুষ্ঠানগুলো করবেন সেখানে তাদেরকে আমন্ত্রন জানাবেন। আমি মনে হয় আজকে প্রথম। আদিবাসী নারী নেত্রী নিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রসপেকটিভটা আমাদের শুনতে হবে। যারা চুক্তির সময় এবং ইনসারজেন্ট প্রিয়ডে রোল প্লে করেছেন তাদেরকে যদি আনা যায় ভাল হয়। চুক্তির মধ্যে কিন্তু নারীর বিষয়টা আসেনি। সেখানে মাত্র তিনজন মহিলাকে রাখা হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী কিছু না তাদের ভূমিকাটা। এই ইস্যুগুলোতে নিয়ে আসার জন্য ভবিষ্যতে এ্যাড্রেস করা হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

#

জনাব ইউসুফ আলম
সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ

আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইয়েরা, উপস্থিত সুধীমন্ডলী। পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা যারা পুরানো বাসিন্দা বাঙালীরা আছি আমরা এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছি। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের শান্তি ফিরে আসুক। সেই লক্ষ্যে যে চুক্তি করা হয়েছিল সেই চুক্তি দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিগত সরকার যেমন চুক্তির কোন কিছুই বাস্তবায়ন করেনি বর্তমান সরকারও চুক্তির দিকগুলো বাস্তবায়ন করবে না সেটা আমরা সবাই সন্দিহান। বরঞ্চ তারা চুক্তিকে বাস্তবায়ন না করে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও সমস্যা সৃষ্টি করছে। সেটা কিভাবে? বিগত কিছুদিন আগে বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে চায়ের চাষ করার যে একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে চা চাষ হবে- যে ভূমিতে সেই ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি এখনও হয়নি। এখন যদি সেখানে নতুন করে এই চা চাষ প্রকল্প শুরু করা হয় তাহলে ভূমির যে বিরোধ তা আরো জোরালোভাবে দেখা দেবে। চুক্তিতে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলিক পরিষদ। সেই আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে সরকার তোয়াক্কা না করে, তাদেরকে অবগত না করে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেটা আদৌ বাস্তবায়ন কিভাবে করা হবে তা জানি না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদকে বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অঅমি আজকে এই সেমিনার থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাবো/ আহ্বান জানাবো- যাতে চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ড আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে হয়। আমরা দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই বিগত আমলে ১৯৮৪/৮৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের

উন্নয়নের নামে যে হাজার হাজার একর ভূমি বন্দোবস্তী দেয়া হয়েছিল, রাবার প্লান্টেশনের নামে সেই জায়গাগুলো তারা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রেখে তারা এ জায়গার বিপরীতে পারমিট সংগ্রহ করেছে। পাহাড়গুলোকে কেটে ন্যাড়া করেছে। পাহাড়গুলোকে বিভিন্ন ব্যাংকে বন্দক দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বহিরাগতরা হিলট্রেক্টস থেকে নিয়ে এসেছে। আজকে পাহাড়গুলো ন্যাড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাহলে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কি উন্নয়ন হয়েছে? পার্বত্য চট্টগ্রামমে যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো হাতে নিতে হবে। আজকে তা না করে সরকারের উপর থেকে এসব উন্নয়নের কর্মকান্ড চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের উন্নতি তো হবেই না বরঞ্চ এই টাকাগুলো শুধু বিভিন্ন অপখাতে ব্যয় হবে। আমি বিগত কিছুদিন আগে মহালছড়ি ঘটনা আমি স্বচোক্ষে দেখেছি। আমি ঐ স্থানে গেছি। গিয়ে দেখেছি যে, মর্মান্তিক ঘটনা। ৪০০ এর উপরে নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী যেভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে এটা সত্যই দুঃখজনক। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করে ফাইদা লুটার জন্য সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি আমি নিন্দা জানাই আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে। আমি পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন আলোচকবৃন্দ অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন সেদিকে না গিয়ে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি যাতে বাস্তবায়ন হয় সে লক্ষ্যে আপনারা যারা সুশীল সমাজ আছেন, সাংবাদিকবৃন্দ আছেন, যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের যা- যা করার দরকার আন্দোলন করার জন্য আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আছি। আগামীতে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে আপনাদেরকে সঙ্গে পাবো এ আশা রেখে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

#

শ্রীমৎ সুমনালংকার মহাথেরো
পার্বত্য চট্টগ্রাম

আজকের আয়োজিত সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত সূধীমন্ডলী। আমরা এতক্ষন ধরে অনেক কিছু শুনলাম, অনেক কিছু জানলাম। আমি আর তেমন সেই অতীতে না গিয়ে এবং এই সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করে যেটা সব চাইতে জরুরী প্রয়োজন এটাই আমি উল্লেখ করতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি আজকে দেখতে দেখতে ছয় বৎসর হয়ে গেল। মানুষের সবকিছুতে একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। এটা মনে হচ্ছে সীমা অতিক্রম হচ্ছে। মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে এবং ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এটাই হলো সব চাইতে এখন চিন্তার বিষয়। আমরা অনেক কিছু ঘটতে দেখেছি। সেই ঘটনার মূলেই রহস্যটা কি এটা আমাদের জানতে হবে। আসলে বারবার এটা আলোচনায় এসে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অঘোষিত সামরিক শাসন আমি মনে করি এটাই হলো মেইন। বাংলাদেশে যে সরকার আসুক না কেন, যতবড় সেই রাজনৈতিক দল হোক না কেন সবাই মনে হয় সেনাবাহিনী বা অস্ত্রের নিকট মাথা নত করে তাদের পরামর্শের মাধ্যমে, তাদের সুপারিশের মাধ্যমে ওরা কার্যক্রম গ্রহণ করে, ওরা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এমনিও একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে নিজের চোখে দেখা তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ বা মন মানসিকতা এটা ব্যক্ত করার মতো না, এটা বর্ণনা করার মতো না। তাদের সেই হিংস্র মনোভাব, তাদের যা অভিরুচি তা তারা বাস্তবায়ন করতে চায়। এটা আমাদের জানা। সম্প্রতি মহালছড়িতে যে ঘটনা ঘটলো, সে মহালছড়িতে এখনও হুমকি দেয়া হচ্ছে। যে সেনা কম্যান্ডারের নেতৃত্বে মহালছড়ি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই কম্যান্ডার নিজেই হূশিয়ারী করছে- যারা আমাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করবে তাদের চামড়া

ছুড়ে মরিচের গুড়া দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা বেশী দেরীর কথা না। হয়তো বেশী হলে মাস খানেক হবে। এমনিও আর একটা হলো সেনাবাহিনীদের যা ইচ্ছা তা করার পিছনে হলো রাজনৈতিক দলের বা সরকারের একটানা সমর্থন। যদি সরকারের সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছা থাকতো বা রাজনৈতিক দলসমূহের যদি দৃঢ়তা থাকতো তাহলে সেনাবাহিনী এটা করতে পারতো না। যেহেতু আমরা জানি বাংলাদেশের জনগণের দেয়া ট্যাক্সের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় খাওয়া, থাকা এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষন ইত্যাদি করা হয়। সেই সেনাবাহিনী জনগণের কথা শুনবে না, দেশের কথা শুনবে না, সরকারের সদিচ্ছার কথা ওরা মানবে না তা হতে পারে না। আমি মনে করি সেনাশাসন যেভাবে চলছে এটা অতিসত্ত্বর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন, এটা অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখেছি সেনাবাহিনী ওখানে সর্বক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। ওখানে জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা বলেন, এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ক্ষমতা বলেন সবকিছু ওদের ইচ্ছামতো এটা করতে হয়। তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই তখন দেশদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে আখ্যা পাওয়া যায়। আর তাদের খেলাও আমরা অনেক দেখেছি। সম্প্রতি আমরা পেপারে পেলাম পার্বত্য এলাকায় অনেক জায়গায় অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এগুলো একটা সাজানো নাটক। আমার মনে হয় যে সমস্ত কাজ ওরা করছে, ওরা চুক্তির আগেও ছিল আবার যখন দাবী জোরদার হচ্ছে তাদের অপসারণ করার জন্য, তাদেরকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য তখন আবার ওরা সেই একই খেলা শুরু করে দিয়েছে। আজকে ওখানে অস্ত্র পাচ্ছে, আগামীতে আরও এক জায়গায় পাবে। যেহেতু ওরা এভাবে আগে অনেক নাটক করেছে, এখনও করছে। এতে তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এভাবে করে সমগ্র জাতিকে ঢোকা দেয়া হচ্ছে। জাতিকে একটা আচরণ দেয়া হচ্ছে যে, এখানে সেনাবাহিনী থাকা প্রয়োজন। আলোচনা শুরুতে উঠে এসেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বনজ সম্পত্তি সেগুন গাছ উজার করেছে ওদের সহযোগীতার দ্বারাই। ওদের মাধ্যমে রাত দুপুরে শত শত গাড়ী বনজ সম্পদ নিয়ে পাচার হয়। কিন্তু ওরা আবার জনগণের সাথে এটা দেখায় যে আমরা চোর ধরি বা পাচারকারীদের ধরি। মূল কথা হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ছয় বৎসর অতিবাহিত হচ্ছে- এর সমাধান কবে হবে? এ ব্যাপারে আমি মনে করি জনসংহতি সমিতি অস্ত্র সমর্পনের মাধ্যমে যে কাজ করে গেছে তা মহৎ কাজ করে গেছে। এখন বাদ বাকী কাজ হলো সরকারের। যে চুক্তি হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা এবং সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রেসার দেয়া এটা বাংলার প্রতিটি জনগণের, প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। সরকার অনেক কিছু করে যখন জনগণ সোচ্চার হয়, যখন গণদাবী উঠে। ঠিক আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারেও গণদাবী উঠা দরকার প্রত্যেকটি কোর্নার থেকে এটার একটা সদিচ্ছার বলবৎ হওয়া উচিত। সব চাইতে মহালছড়ি ঘটনা তো নিত্য নতুন নয়। এভাবে আরো অনেক ঘটনা ঘটবে তাই আমাদের মাঝে সব সময় একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। আর বর্তমান যে পরিবেশ- আমাদের মাঝে এমনভাবে একটা বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে- যে বিভাজনের মধ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নিজেকে জড়িত রেখে যে কোন অনাকাঙ্খিত পদক্ষেপ নিতে সহজ হয় তার সহযোগীতা করছে।

আপনারা জানেন- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি সাংসদ জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া উনি চেয়ারম্যান হওয়ার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো যে, সব সেটেলারদের ওখানে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য একটা ব্যবস্থা নেয়া। কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে- বর্তমান যে কমলা বাগান, আম বাগান। মাটিরাঙ্গায় খাগড়াছড়িতে আসার পথে সাইন বোর্ড দেখা যায়। কমলা বাগানে যে ৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাতে একটি পাহাড়ী পরিবারও নাই। সব পরিবার হলো সেটেলার। পাহাড়ীদের প্রকল্পগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সরিয়ে এনে সেটেলারদের সেগুলো বিতরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। উনি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে এসে সেটেলারদেরকে পাহাড়ী জায়গায় পুনর্বাসন করেছেন। কাজেই এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই জুম্ম জনগণ ভূমিহীনে পরিনত

হতে বাধ্য। তিনি চাচ্ছেন আমাদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে শান্তি চুক্তি যাতে বাস্তবায়ন না হয় তার একটা পদক্ষেপ বা তার একটা ব্যবস্থা নিতে। আমার মনে হয় বর্তমান সরকার জেনে শুনে হোক বা না জেনে হোক ঐ এমপি মহোদয়কে সমর্থন করে যাচ্ছেন। না হলে একটা প্রতিবাদ আসতো। এটা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বা এর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যখন আওয়ামী লীগ আমলে তিনজন এমপি ছিলেন। তিনজন এমপি'র মধ্যেও আমরা দেখেছি কতিপয় এমপি ঐ চুক্তির বিরোধীতা বা চুক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে রাখার জন্য কোন না কোন অজুহাত তুলে ইস্যু সৃষ্টি করতেন। যেমন নাকি ভারত প্রত্যাগত ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। সেই টাস্কফোর্সে পাহাড়ীদের সাথে সাথে সেটেলারদেরকেও পুনর্বাসন দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। ওদেরকেও তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল। এভাবে তারা কালক্ষেপন করেছিল। অনুরূপভাবে এখনও চলছে। কাজেই আমরা মনে করি আসলে সদিচ্ছার প্রয়োজন বারবার এভাবে যাতে না হয়। একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে আমাদের। যদি আমরা সবাই স্বীকার করি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শুধু পার্বত্য এলাকার জন্য নয়, এটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য, সমগ্র বাংলাদেশীদের জন্য তাহলে আমরা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবদিক থেকে একটা সদিচ্ছা এনে এ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যাতে একটা জোরালো দাবী উঠে। আমি আশা করি আমরা এভাবে আর সেমিনার বা সভা সমিতি ইত্যাদি করে কালক্ষেপন না করে সবাই যদি সোচ্চার হই, এ্যাকশন প্লান করি তাহলে অতিসত্ত্বর এ চুক্তি বাস্তবায়ন হবে। এটা বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হোক এটাই আমি কামনা করে আপনাদের সকলকে মৈত্রীপূর্ণ শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

২ ডিসেম্বর ২০০৩, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২ ডিসেম্বর ২০০৩ ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা লিখিত বক্তব্য পেশ করেন এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এই অংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য পত্রস্থ করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংবাদিক সম্মেলন

২ ডিসেম্বর ২০০৩, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা সকলেই জানেন যে, আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে দু'পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত ৬টি বছরে চুক্তির কতিপয় বিষয় বাস্তবায়িত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বা অবস্থা এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে বিরাজমান পার্বত্য চট্টগ্রমের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করা জরুরী বলে মনে করছি।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বশাসন নিয়ে বসবাস করে আসছিল। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা, অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে চাঁদিগাং বা চট্টগ্রাম ছিল একটি স্বাধীন সামন্ত রাজ্য। ১৭৮৭ সালে চাঁদিগাং বৃটিশ শাসনাধীন করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৬০ সালে সমতল অঞ্চল নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বঙ্গ প্রদেশে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাধীন শাসন বহির্ভূত এলাকা বা পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯০০ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০" প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। উক্ত শাসনবিধিতে আদিবাসী পাহাড়ী বা জুম্ম ব্যতীত বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের ও ভূমির মালিকানা স্বত্ব লাভের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উক্ত শাসনবিধির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল ঘোষণা দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হলে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বৃটিশ ভারতে অন্তর্ভূক্ত অপরাপর বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের বিশেষতঃ ভূমি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধান ছিল। সেই ঐতিহাসিক ধারা অনুসরে আমাদের দেশের "জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন- ১৯৫০" এর ৯৭ ধারায় আদিবাসীদের জমি আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। স্বাধীন রাজার আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ সামন্ততান্ত্রিক

শাসন-শোষণে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল যখন ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ শাসনের আওতাধীন হয় তখন থেকে জুম্ম জনগণের উপর যুক্ত হয় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। সাধারণ জুম্ম নর-নারী গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। সামন্ত ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সম্মিলিত শাসন-শোষণে জুম্ম জনগণের উপর বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালে তথাকথিত দ্বি-জাতি তত্বের ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক "ভারতের স্বাধীনতা আইন-১৯৪৭ প্রণীত হয়। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে উক্ত আইন অনুসারে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান এবং অপরাপর অঞ্চল নিয়ে ভারত ডোমিনিয়ন গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। তদনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের পক্ষ হতে স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভূক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে দেশ বিভাগ হয় । দেশ বিভাগকালের উক্ত ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর সাধারণ আদিবাসী জুম্ম জনগণের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে নি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ লুণ্ঠন ও ভূমি বেদখলের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমতল অঞ্চলের কিছু সংখ্যক বাঙালী ব্যবসায়ী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনে নিয়োজিত অস্থানীয় বাঙালী কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এই ঘটনার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহন করে। হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার সুবিধার্থে তারা পাকিস্তান সরকারকে আদিবাসী পাহাড়ী বিরোধী নীতি গ্রহনে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। ফলে একের পর এক জুম্ম বিরোধী কার্য্যক্রম বাস্তবায়িত হতে থাকে। ঊনিশ শো পঞ্চাশ ও ষাট দশকে ভারত থেকে বিতাড়িত অনেক বাঙালী মুসলিম পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি দেওয়া হয়। দেশে শিল্পায়ন ও বিদ্যুতায়নের নামে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল শস্যভান্ডার চুয়ান্ন হাজার একর সমতল চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন করা হয় এবং প্রায় লক্ষাধিক জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালীকে নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৪০ হাজার জুম্ম নর-নারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কতিপয় সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তায় যেভাবে বাঙালী জনগণের উপর নানাভাবে নিপীড়ণ-নির্যাতণ চলতে থাকে তেমনিভাবে অপরাপর অঞ্চলের সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষতঃ জুম্মদের উপর শাসন-শোষণ ও নির্যাতন চলতে থাকে। এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে ধাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ধীরে ধীরে আন্দোলনের দিকে এগুতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নির্বাচিত হন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময়কার প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম ছাত্র ও যুবকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহন করে এবং সামরিক প্রশিক্ষন নিতে শুরু করে। কিন্তু তদানীন্তন জেলা প্রশাসক এবং আওয়ামী লীগের উগ্রজাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক কতিপয় ব্যক্তির বিরোধীতায় তাদেরকে কৌশলে দূরে সরে দেওয়া হয়। তদসত্ত্বেও মং সার্কেলের মং চীফসহ অনেক জুম্ম মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হয়। বাঙালী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নতুন দেশের নতুন সরকারে পূর্বতন সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী মহল উগ্র-বাঙালী জাতীয়তাবাদের আড়ালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর শোষণ ও নিপীড়ণ অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ১৯৭২ সালে দেশে নুতন সংবিধান রচিত হয়। সেই সময়ে গণপরিষদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও

অন্যান্য সকল জুম্ম নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনসহ চারদফা দাবীনামা সরকারের নিকট উত্থাপন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংবিধানে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তির দাবী জানান। আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দাবীসহ অন্যান্য সকল দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। বরঞ্চ রাজাকার, মুজাহিদ এবং ভারতের মিজো বিদ্রোহীদের দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ণ-নির্যাতন চালান হয়। সেনানিবাস স্থাপন, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল জোরদার হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের নীতি গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অধিকতর পরিমানে সেনা বাহিনী নিয়োগ ও সেনা ছাউনী স্থাপনসহ সমতল অঞ্চল হতে সরকারী পরিকল্পনাধীনে পাঁচ লক্ষাধিক সেটেলারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয় এবং জুম্ম জনগণের ভূমির উপর অবৈধ পুনর্বাসন হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্ম ও বাঙালী সেটেলারদের মধ্যকার ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা দেশের অন্যতম জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের জন্য সংলাপের পথ বরাবরই উন্মুক্ত রাখে। তাই সরকার পক্ষ হতে ১৯৭৯ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের অনুকুলে বক্তব্য উত্থাপন শুরু হয়। অতপর ১৯৮৫ সাল হতে তিনটি সরকারের আমলে- জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে ৬ বার, খালেদা জিয়া সরকারের আমলে ১৩ বার এবং পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ৭ বার মোট ২৬ বার অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী তথা দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে আশার সঞ্চার করে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীগণ নিপীড়ন-নির্যাতন ও শোষণ-বঞ্চনার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কতিপয় বিষয় বাস্তবায়িত হলেও মৌলিক বিষয়াবলী আজ অবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষ শাসন কাঠামো অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা, টাস্কফোর্স গঠনের মাধ্যমে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া হাতে নেয়া, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও জুম্ম শরণার্থীদের অনেককে চাকুরীতে পুনর্বহাল, অল্প সংখ্যক অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের অভীষ্ট লক্ষ্য রয়ে গেছে সুদূর পরাহত। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো -

"ক" খন্ড: সাধারণ

- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই ধারা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ সরকার পক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়নি।
- ❑ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিনীতিসমূহ প্রণয়ন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্য্যবিধিমালা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসমূহের আইনসমূহ প্রণীত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি -১৯০০ সাল এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্য্যবিধিমালা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট অন্যন্য আইন ও বিধানাবলী সংশোধন করা হয়নি।
- ❑ বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এখনো পুনর্গঠিত হয়নি।

"খ" খন্ড: জেলা পরিষদ

- ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণীত হয়নি। এখনো দলীয় মনোনয়নের ভিত্তিতে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিষদসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে।
- ❑ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি।
- ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পার্বত্য জেলা পুলিশসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ হস্তন্তর ও কার্যকর করা হয়নি।
- ❑ অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ এবং সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এই ধারা লঙ্ঘন করে সার্কেল চীফের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান চালু করা হয়েছে।
- ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে এখনো উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি।
- ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার কার্যকর করা হয়নি।

"গ" খন্ড: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালাা সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালার উপর সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়নি।
- ❑ বাজেট অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থ বরাদ্ধের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি আঞ্চলিক পরিষদ কার্য্যালয় নির্মাণ খাতে অর্থ সরবরাহ করা হয়নি।
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধিত হয়নি।
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যথাযথভাবে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করার বিধান যথাযথভাবে কার্য্যকর করা হয়নি।

- ❑ উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি এবং গ্রাম সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো হতে পারেনি।
- ❑ আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পরিবারসমূহকে এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি।
- ❑ ভুমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়নি।
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) এখনো কার্যকর ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়নি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এখনো সংশোধন করা হয়নি।
- ❑ রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে প্রদত্ত জমির লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি। উপরন্তু এই ধারা লঙ্ঘন করে লীজ দেয়া অব্যাহত রয়েছে।
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। চলতি অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) থেকে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে।
- ❑ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
- ❑ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- ❑ জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে সাথে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। সামরিক আদালতে রুজু করা মামলাসহ এখনো অনেক মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি।
- ❑ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ করা হয়নি। সমিতির সদস্যদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলেও তাদের জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়নি। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়নি।
- ❑ ৫ (পাঁচ) শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প ব্যতীত অবশিষ্ট অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন বেসামরিকীকরণ করা হয়নি। বরঞ্চ 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে না।
- ❑ চুক্তি অনুসরণে বর্তমান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জুম্মদের মধ্য থেকে এখনো মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। অপরদিকে চুক্তি মোতাবেক গঠিত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি বর্তমান সরকারের আমলে কার্য্যকর করা হয়নি।

- ❑ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উথাপন করা হয়। এই লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ২০০১ সালের ডিসেম্বর ও ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে ২০ এপ্রিল ২০০২ আলোচনা করেন এবং ৩০ দফা সম্বলিত বিষয়াবলী পেশ করেন। তৎপরবতীকালেও জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান এবং আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উথাপন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে

অদ্যাবধি তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকার আমলে সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতা আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়াঁকে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করাসহ জুম্মস্বার্থবিরোধী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এ সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচেছ এবং ঘোলা পানিতে মাছ ধরার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সেনাক্যাম্পের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল বাঘাইহাট বাজার হামলা, ১৯৯৯ সালের ১৬ অক্টোবর বাবুছড়া বাজার হামলা, ২০০১ সালের ১৮ মে দীঘিনালাস্থ বোয়ালখালী-মেরুং হামলা, ২০০১ সালের ২৫ জুন রামগড় হামলা, ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল মাসে ভূয়াছড়ি হামলা এবং অতি সম্প্রতি ২০০৩ সালের ২৬ আগষ্ট মহালছড়ি হামলা সংঘটিত হয়েছে। মহালছড়ির জয়সেন কার্বারী পাড়া ও লেমুছড়ি, খাগড়াছড়ির ভূয়াছড়ি, বরকলের বিল্লছড়া, আলীকদমের চিওনী পাড়া ইত্যাদিসহ অনেক গ্রাম থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ করে বেদখল করা হচ্ছে জায়গা-জমি। আর সেনাছাউনি সম্প্রসারণ ও বনবিভাগের বনায়নের নামে স্থায়ী বাসিন্দাদের হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। অপরদিকে ইউপিডিএফ নামে এক সশস্ত্র গ্রুপকে সরকারের একটি বিশেষ মহল কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিয়ে জুম্মকে দিয়ে জুম্ম হত্যা তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার অপপ্রয়াস চলছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির দিন দিন চরম অবনতি ঘটছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

সামগ্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সমাধান ও জুম্মদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান হয়নি। অপরপক্ষে সংঘাতকালীন সময়ে গৃহীত সামরিক সমাধানের নীতি অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও সেটেলার বসতি সম্প্রসারণ, সেনাশাসন এবং জুম্মদের উপর দমনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বলা বাহুল্য, এর পরিণাম কখনোই শুভ হতে পারে না। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট পুনরায় জোর দাবী জানানো হচ্ছে -

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিগ্রস্ত ও মহালছড়ি ঘটনার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং তৎস্থলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত পদে একজন যোগ্য উপজাতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা।

(৩) অনতিবিলম্বে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা।

পরিশেষে উক্ত বিষয়াদির ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী সকল স্থায়ী বাসিন্দাসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে

দেশ স্বাধীন হলেও এযাবৎ কোন সরকারই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মজুর, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমার তথা আপামর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পরিবর্তে কেবলমাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিংবা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে গণবিরোধী নানা আইণ প্রণয়ন ও কার্য্যক্রম গ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। সারা দেশে দূর্নীতি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন ও সাম্পদায়িকতা চরম পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে। আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের উপর শোষণ-নিপীড়ন ও ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতজানু পররাষ্ট্র নীতি সমগ্র দেশ ও জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আরও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছে। পরিনতিতে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিন দিন চরম অবনতি ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। সারা দেশে উত্তরোত্তর অশান্তি ও নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অপরাপর অঞ্চলের আদিবাসী ও সংখ্যালঘুসহ দেশের শ্রমিক, মজুর, কৃষক তথা সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জানমালের নিরাপত্তা বিধান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হতে চলেছে। এ প্রেক্ষিতে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য্য। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর এবং গণমুখী ও অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সরকারই আদিবাসী ও সংখ্যালঘুসহ এ দেশের শোষিত ও নিপীড়িত সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে তুলতে পারে। তদুদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এর ভিত্তিতে কর্মসূচী প্রণয়ন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অতীব জরুরী। আপনাদের উপস্থিতি ও সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

এই অংশে বাংলাদেশ সরকারের গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঢাকায় স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পত্রস্থ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি

(১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন তরিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবে।
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন" -- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর

বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্ত র্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;
ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতরে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিরি পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ
ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);
গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
ঘ) বিভাগীয় কমিশার/অতিরিক্ত কমিশনার
ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসেনর লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক

দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;
৮) সাংসদ, বান্দরবান;
৯) চাকমা রাজা;
১০) বোমাং রাজা;
১১) মং রাজা;
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)	**(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)**
আহ্বায়ক	সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
বাংলাদেশ সরকার	

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০০৪ ॥
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০০৪ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০ টাকা

Parbatya Chattagramer Chukti Bastabayan Prasange published by Information and publicity Department of parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2004 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Tel : +880-351-61248
E-mail : pcjss@hotmail.com, Website: www.pcjss.org

Price : Tk. 30.00 only